Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

ত্রয়োদশ বর্ষ❖সংখ্যা ৪❖ডিসেম্বর ২০২৩

বিশেষ রচনা ঃ বানর থেকে মানুষ!!

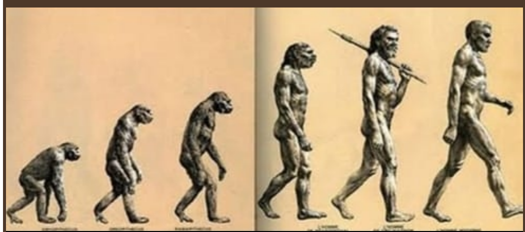

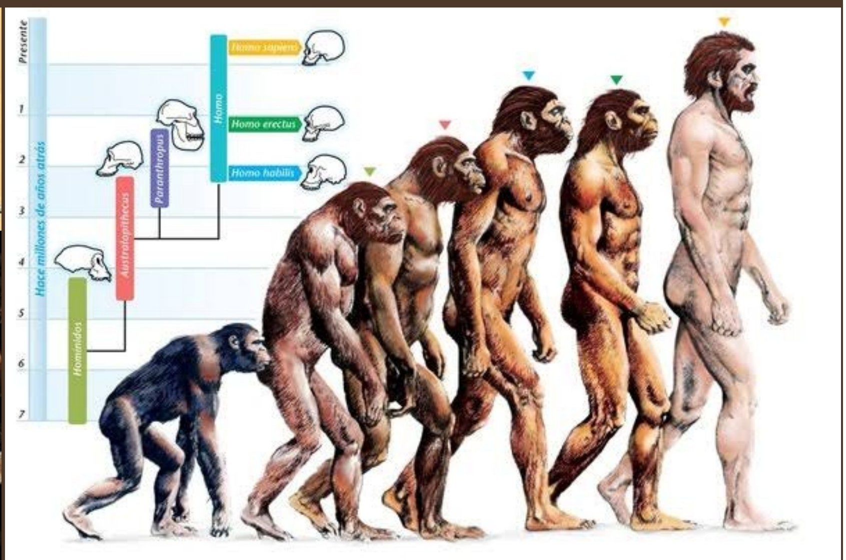

ঃ সম্পাদকীয় ঃ

'কারাগার' থেকে মুক্তি কোন পথে?

ঃ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ – পরিবেশে প্রভাব ও প্রতিকার (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

ঃ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

ত্রয়োদশ বর্ষ❖সংখ্যা - ৪❖ডিসেম্বর ২০২৩

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ বিশেষ রচনা ঃ ৪

◆বানর থেকে মানুষ !!

◆'জনস্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ...

◈ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৩

◆বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন

◆বিজ্ঞানী জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন

◈ মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ ২১

◆কোয়েসার্স আসলে ব্ল্যাকহোল

◈ কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ ২২

◆দেবতার পায়ের ছাপ

◈ অতিথি কলাম ঃ ২৩

◆চোখ – আমাদের মনের জানালা

◈ বিজ্ঞানের খবর ২৫

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ২৭

◆কৃষিতে সার, কীটনাশক ... পরিবেশে প্রভাব

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩১

◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ ছাত্রছাত্রীদের কলম ঃ ৩৪

◆আমাদের পরিবেশ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৮

◈ ছড়া ঃ ৩৯

◆ছড়ায় নামতা

◈ সমাজ দর্পণ ঃ

◆উদ্ধার পেলেন একচল্লিশজন সুড়ঙ্গে আটক শ্রমিক

সম্পাদকীয় ঃ

'কারাগার' থেকে মুক্তি কোন পথে?

এমন কারাগারের কথা কেউ শুনেছেন, যার চার দেওয়াল হল আন্তর্জাতিক সীমানা? অনেকে বলেন যে এখানকার বাসিন্দাদের এটা স্বদেশভূমি। কিন্তু স্বদেশের সীমার দু'পাশে থাকে দুদেশের কাঁটাতার, মাঝে থাকে জনমানব শূন্য নো ম্যানস ল্যান্ড। জলসীমার ক্ষেত্রেও দু'দেশের সীমা একটি মধ্যবর্তী দূরত্ব বজায় রেখে চলে। অথচ এই ভূখণ্ডের সীমা কারাগারের পাঁচিল নয়, তা হল বিভিন্ন দেশের বেড়া। এর পূর্বে এবং উত্তরে রয়েছে ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইসরায়েলের সেন্সর বেড়া। এমনকী সেই বেড়ার নীচে ভূগর্ভে রয়েছে পাঁচিল। এর দক্ষিণে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় নির্মিত ইস্পাতের বেড়া। আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের জলরাশি। এই কারাগারের নাম হল গাজা। তাই এই অঞ্চল ফিলিস্তিনিদের স্বদেশ হলেও তা একই সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক কারাগার। যে কারাগারের বাসিন্দারা অবশ্যই বেড়ার ওপারের দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণকারী শাসকদের অধীন। এখানকার বন্দীরা এখানে আজীবন বন্দী থাকবেন। কেননা তাঁদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এমন এক আজব কারাগারে শুধু আজীবন বন্দী না থেকে, বিনা অপরাধে ঠিকানা লেখা যুদ্ধাস্ত্রের কবলে পড়ে শত-সহস্র শিশু-নারী-হাসপাতালে ভর্তি থাকা চিকিৎসাধীন আর্তজনকে প্রাণ দিতে হয়, বোমার হামলায় ভেঙে পড়া কংক্রিটের দেওয়ালের নীচে প্রাণ দিতে হয়। যাঁরা কোনো রকমে এখনো বেঁচে, তাদের এই ভূখণ্ডের উত্তর অংশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

আক্রমণকারী ইসরায়েলের স্বপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে তারা প্রথমে আক্রান্ত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেক বিশেষজ্ঞ ইঙ্গিত করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১-র হামলাকে এবং তাকে হাতিয়ার করে বিশ্বজোড়া 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র সঙ্গে সাদৃশ্য দেখছেন। উগ্র ইসলামপন্থী হামাস সংগঠন (একসময় যাকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যাকে কাজে লাগিয়েছিল) ৭ই অক্টোবর ২০২৩-এ সে স্থল-জল-আকাশ পথে ইসরায়েলের সীমান্তে আক্রমণ করেছিল, সে দেশের নাগরিকদের বন্দী করে নিয়ে চলে গেছিল, তারা কি জানতো না এই আক্রমণের প্রতিআক্রমণ কতখানি হতে পারে? যে দেশ অতি-আধুনিক সামরিক প্রযুক্তিতে বলীয়ান, যার পিছনে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেই দেশের সীমানায় আক্রমণের জবাবে যাদের প্রাণ গেল তাঁরা ও তাঁদের পরিজন যুদ্ধরত দু'পক্ষকেই ক্ষমা করবেন না। পাশাপাশি বলার যে ফিলিস্তিনী জনতার সংগ্রাম, সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম নয়। হামাস একটি উগ্র ইসলামপন্থী সংগঠন হয়ে সম্ভাব্য ইসরায়েল-সৌদি সমঝোতাকে

বানচাল করতে এমন পদক্ষেপ নিতে পারে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। কিন্তু ফিলিস্তিনীদের ধারাবাহিক সংগ্রাম এর অনুসারি সংগ্রাম নয়, ইতিহাস তার সাক্ষী। পাশাপাশি এটাও বলা দরকার যে গাজাবাসীর জন্য যতই মৌখিক দরদ দেখাক কার্যতঃ কোন মুসলিম রাষ্ট্র আক্রান্ত জনতার পাশে নেই।

পশ্চিমী শক্তি বিশেষ করে ইঙ্গো-মার্কিন শক্তি যতই ইহুদীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, 'বাড়ি ফিরে আসা' হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করুক ইতিহাসের কতগুলি ঘটনা তাদের জন্য অস্বস্তিকর। খুব সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব সীমানায় উপকূলবর্তী একফালি চাঁদের আকৃতির ভূখন্ডটি ছিল মানব ইতিহাসে প্রাচীনতম কৃষি ও নাগরিক জীবনের বাসস্থান। যদি এখানকার আদি বাসিন্দাদের কথা আলোচিত হয়, তবে হিব্রুভাষী বা আরবি ফিলিস্তিনীরা কেউ এখানকার আদি বাসিন্দা নয়। হিব্রুভাষীরা এখানে এসেছিল খৃঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকে। রাজা ডেভিড (অর্থাৎ নবী দায়ুদ)-এর শাসনকাল পার করে। এখানে ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রীসের শাসকরা আধিপত্য স্থাপন করে। ১৬৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ইহুদীরা তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। এরপর রোমানরা এই অঞ্চল দখল করে। রোমানরাই এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল যুদিয়া প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিন। রোমান শাসনকালে ইহুদীরা দু'বার (৬৬-৭০ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৩২-১৩৫ খৃষ্টাব্দ) বিদ্রোহ করেছিল ও ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্রোহীরা তখন থেকেই বিদেশে, মুখ্যত ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে আরবরা এই অঞ্চল দখল করে এবং চারশো বছরের বেশি সময় এখানে আরবী ভাষাভাষীদের শাসন চলে। এই সময় থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণ চালু হয় এবং আরবী ভাষা এখানে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু এই অঞ্চলটি আবার অন্যান্য জাতির আধিপত্যে চলে যায় এবং অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদেশে বসবাসকারী ইহুদীদের মধ্যে ফিলিস্তিনকে ইহুদীরাষ্ট্রে পরিণত করার দাবি প্রকাশ্যে আসে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জায়নবাদী কংগ্রেসে। এই জায়নবাদ হল ইহুদী জাতীয়তাবাদ। এর প্রবক্তা ছিলেন থিওডোর হের্জল। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল ব্রিটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা করে। বিরোধী পক্ষে থেকে যায় দুই উপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স। যুদ্ধচলাকালীন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ব্রিটেন-ফ্রান্স-জারের রাশিয়ার মধ্যে এক গোপন চুক্তি হয়। এই চুক্তির নাম সাইকস্-পিকট চুক্তি। এই চুক্তিকালীন রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই সাজোনভ উপস্থিত থেকে তা অনুমোদন করে। এই চুক্তি অনুসারে সমগ্র অঞ্চলটিকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করে যুদ্ধোত্তরকালে কিভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্সের দখলে থাকবে তা ঠিক হয়। ভাগ হওয়া ভূখন্ডের পঞ্চম অঞ্চলটি সম্পর্কে চুক্তিতে স্থির হয় যে এটি একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল, যার মধ্যে পড়েছিল জেরুজালেম, সানজাক, প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশ। এখানে ইহুদী, ইসলাম এবং খ্রীষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের ধর্মস্থান অবস্থিত। এই গোপন চুক্তি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ইজভেস্তিয়া পত্রিকায় সরাসরি প্রকাশ করে দেয়। লেনিন বলেছিলেন এটি "উপনিবেশিক চোরদের চুক্তি"। বিশ্বযুদ্ধকালীন চুক্তিটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন অটোমানদের পতন আসন্ন হয়। ২রা নভেম্বর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব বেলফোর ফরেন অফিস থেকে একটি সিল করা খামে ব্যারন লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ডের কাছে পাঠান। চিঠিতে পরিষ্কার লেখা ছিল যে জায়নবাদীদের আকাঙ্খাকে সমর্থন করছে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা। লেখা ছিল 'মহামান্য ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদী জনগণের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে, তবে এটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে যে এমন কিছু করা উচিৎ হবে না যা ফিলিস্তিনে অবস্থানরত অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার এবং অন্য দেশে বসবাসকারী ইহুদীরা যে অধিকার এবং রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করছে, তার কোন হানি হয়।'

বেলফোর এই চিঠিটি সরাসরি জায়নবাদী ফেডারেশনের কাছে না পাঠিয়ে পাঠিয়েছিলেন তখনকার ধনীতম ব্যক্তি রথচাইল্ডের কাছে। এছাড়া তৎকালীন ধনী ইহুদীরা এই ফেডারেশনের মধ্যে ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর, বেলফোর ঘোষণাটি মিত্রশক্তির সমর্থন পায়। তার আগেই ব্রিটেন অঞ্চলটি অটোমানদের থেকে দখল করেছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লীগ অফ নেশন এই অঞ্চলে আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

বেলফোর ঘোষণার পর ইহুদীরা বিদেশ থেকে ফিলিস্তিনে আসতে থাকে। জার্মানিতে হিটলারের অত্যাচারের ফলেও বিতাড়িত হয়ে অনেক ইহুদী ফিলিস্তিনে চলে আসে। এই ইহুদী আগমন যে শান্তিপূর্ণভাবে জমি কিনে বসতিস্থাপন ছিল না, তা বোঝা যায় ফিলিস্তিন মুক্তি সংগঠনের নেতৃত্বে ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯২৯-এর আন্দোলন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি হয় ফিলিস্তিন। যুদ্ধের পর স্থাপিত রাষ্ট্রসংঘ ব্রিটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনকে দু'টুকরো করে বৃহৎ অংশে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল এবং দু'প্রান্তে দুটো অঞ্চলে আরব রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব পাশ করে। কিন্তু তখনকার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, আরবের কয়েকটি রাষ্ট্র এবং ভারত এই বিভাজনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মে মধ্যরাতে ব্রিটিশ ম্যানডেটের অবসান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে ইসরায়েল ইহুদী রাষ্ট্রের জন্ম হয় একই সঙ্গে। এখনো পর্যন্ত এই দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্ব প্রসঙ্গে ভারত অবস্থান

●শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দেখুন ➔

বিশেষ রচনা ঃ

বানর থেকে মানুষ !!

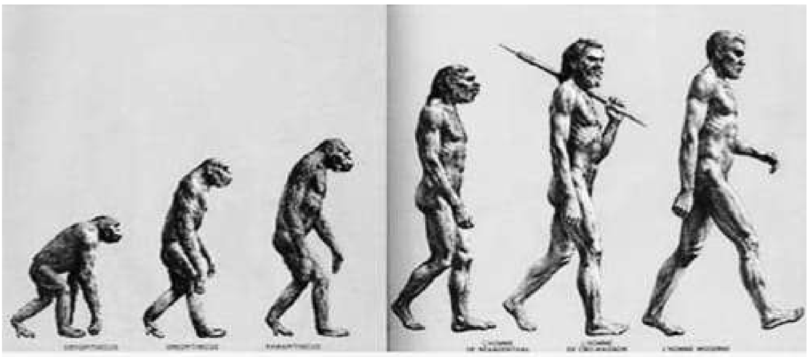

মানুষের বিবর্তন নিয়ে জনমানসে একটি অস্বচ্ছ ধারণা আছে। অনেকের ধারণা বানর (monkey) থেকে নাকি মানুষের উৎপত্তি। ডারউইন নাকি এমনটা বলে গেছেন। এই ধারণার নেপথ্যে বহু কারণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি ছবি। এই ছবিটি মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরিতে অনেক বইয়ের প্রচ্ছদে, বিজ্ঞান মহলে, প্রদর্শনীতে, এমনকি বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে ও ব্যবহৃত হয় একটি ছবি। এই ছবিটি **১৯৬৫** খ্রিস্টাব্দে এঁকেছিলেন শিল্পী রুডলফ জালিংগার। ছবির নাম "মার্চ অফ প্রগ্রেস"। প্রথম ছাপা হয়েছিল "লাইভ নেচার লাইব্রেরী" পত্রিকায়। তারপর এই ছবিটি অসংখ্য পত্রপত্রিকায়, বইতে প্রকাশিত হতে হতে পরিবর্তিত হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছয়টি প্রাণী হাঁটার ভঙ্গিমায় পরপর আছে। সবার পিছনে প্রায় বানরের মতো একটি প্রাণী, সে সামনের হাত দুটো কোনভাবে উপরে তুলে দু পায়ে ভর করে হাঁটার চেষ্টা করছে। তারপর একটি শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণী। দু পায়ে থাকলেও সামনের হাতে তাকে তার দেহের ভর রাখতে হচ্ছে। তার সামনের দিকের ছবিগুলো পরপর একটু লম্বা, একটু কম কুঁজো এবং বলিষ্ঠ। একেবারে সামনে আছে বুক উঁচু করে পুরোপুরি সোজা হয়ে দু পায়ে দাঁড়িয়ে আধুনিক মানুষ, হোমো সেপিয়েন্স। তাদের হাতের হাতিয়ার ও ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। মানুষের বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে এই ছবিটি অনেক সহজবোধ্য ও সর্বজনগৃহীত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আধুনিক মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে এই ছবিটি সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে না। ডারউইন কখনোই কোথাও বলেননি যে বানর থেকে আধুনিক মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বরং তিনি বলেছিলেন বানর, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, গরিলা সবার শরীর ও স্বভাব মানুষের কাছাকাছি। এদের আর মানুষের সাধারণ পূর্বসূরী একই ছিল। **বর্তমান তথ্য হলো বানর বা বনমানুষ মানে এপ থেকে মানুষ এক সরলরেখায় উদ্ভব হয়নি। কিন্তু তাদের এক সাধারণ পূর্বসূরী ছিল।**

তাছাড়া সেই সময়কার চার্চগুলো ছিল প্রচন্ড প্রভাবশালী। ব্রুনোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, কোপার্নিকাস বা গ্যালিলিওর যে দুর্দশার কথা আমরা জানি তা থেকে সেই সময়কার সমাজে চার্চের প্রভাব সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি। চার্লস ডারউইন **১৮৫৯** খ্রিস্টাব্দে বিবর্তনবাদ নিয়ে তার বিশ্ব বিখ্যাত বই "অন্য দ্য অরিজিন অফ স্পিসিসি মিনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন" প্রকাশ করেন। মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে বই লিখলেও তা তখন প্রকাশ করার সাহস পাননি। বিজ্ঞানী টমাস হ্যাক্সলি যিনি 'ডারউইন বুলডগ' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি **১৮৬৩** খ্রিস্টাব্দে তার "এভিডেন্স অ্যাজ টু হিউম্যান প্লেস ইন নেচার" বইতে বন মানুষ ও মানুষের বিবর্তন নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখেন। তিনি প্রথম ধারণা দেন যে বানর, বনমানুষ, মানুষ কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তার আট বছর পর **১৮৭১** খ্রিস্টাব্দে ডারউইন মানুষের বিবর্তন নিয়ে একটি বই প্রকাশ করলেন, "দ্য ডিসেন্ট অফ ম্যান" তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন – বিবর্তনের পথে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের পূর্বসূরী এক।

ডারউইন তাঁর এই বই প্রকাশ করার পর দারুণভাবে সমালোচিত হলেন। তখনকার দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বানরের আকৃতির ছবি বা বানরের শরীরে তার মাথা লাগিয়ে কার্টুন করে প্রকাশ করত। অথচ ডারউইন কখনোই তার বইতে লেখেননি বানর (মাঙ্কি) থেকে মানুষ উদ্ভব হয়েছে। তবুও তাকে নানাভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল তিনি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আঘাত এনেছিলেন। কারণ মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস বলে মানুষের সৃষ্টি কোন ঈশ্বরের দ্বারা হয়নি। আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েন্স হলো বিবর্তনের ফসল। যাইহোক ডারউইনের পরবর্তী বহু বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষজন মেনে নিয়েছিলেন এপ ও মানুষ সাধারণ পূর্বসূরী থেকে উদ্ভূত। তবে

তারা মনে করেছিলেন সেই সাধারণ পূর্বসূরী থেকে মানব বংশের উদ্ভব হলো একমুখী। কিন্তু বর্তমান আধুনিক ফসিল গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে এদের পূর্বপুরুষ একই হলেও এরা বিভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছে।

ডারউইন মনে করতেন সমস্ত জীবদের মধ্যে সম্পর্ক হল গাছের কান্ড ও শাখা প্রশাখার মতো। গাছের কিছু শাখা টিঁকে আছে আর তার কিছু শাখা বিভিন্ন কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ডারউইনের মতে একই সাধারণ পুর্বসূরী থেকে বহু উত্তরসূরী বের হয়েছে। তার একটি থেকে বিবর্তনের পথে এসেছে আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স। অন্যদিকে এপ বা বানরদের সব উত্তরসূরী টিকে নেই বা সেই উত্তরসূরী আধুনিক মানুষের বিবর্তনের লক্ষ্যে একমুখী হয়নি। তার ধারণা যে অনেকাংশে সঠিক তা আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ডারউইনের মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার উৎস ছিল ফসিল বা জীবাশ্ম গবেষণা। আর বর্তমানেও মানুষের বিবর্তনের উৎস সন্ধানে কার্যকরী ভূমিকায় আছে জীবাশ্ম গবেষণা। বিগত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানব বিবর্তনের মিসিং লিঙ্ক বা হৃতযোজক কিন্তু বহু জীবাশ্ম। মানুষের বিবর্তনের পথে হারিয়ে যাওয়া বহু প্রাণীদের জীবাশ্ম গবেষনা করে জানা গেছে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের এক সাধারণ পূর্বসূরী ছিল। আজ থেকে প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে গরিলা বংশ বা হোমিনিড গোত্র পৃথক হয়ে যায়। বানর, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের সাধারণ পূর্বসূরী থেকে মানব বংশ বা হোমিনিন গোত্র প্রায় ৭০ লক্ষ বছর আগে পৃথক হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে মানুষের কাছাকাছি হোমো গণভুক্ত অনেকগুলি প্রজাতির উদ্ভব ঘটে, এদের মধ্যে হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেকটাস, হোমো নিন্ডারথ্যালেন্সিস উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে শেষের প্রজাতি ছিল বর্তমান ও আধুনিক মানব হোমো সেপিয়েন্সের খুব কাছাকাছি। তবে আধুনিক মানব ছাড়া হোমো গণ ভুক্ত বাকি সব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা শুধু জীবাশ্ম গবেষণাতে সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক ডিএনএ বা জিন বিশ্লেষণ দ্বারা মানব বিবর্তনের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। আমরা প্রত্যেকেই জানি জিন বা ডিএনএ-এর প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে সহজেই কে কার পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাইবোন, বংশধর বলে দেওয়া যায়। তাই ডিএনএ বিশ্লেষণ অনেকটাই অব্যর্থ ও প্রমাণিত। বর্তমানে বানরের যতগুলো জীবিত প্রজাতি আছে সবগুলোর সাথে মানুষের ডিএনএ-র মিল ৮০-৯০ শতাংশ। মানুষের সঙ্গে গরুর মিল ৮০%, বিড়ালের সঙ্গে ৯০% আর শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মিল ৯৮.৭%। বানরের সাথে মিল ৯৮.৮ শতাংশ। দেখা গেছে এই বানর জাতীয় প্রাণীদের সাথে মানুষের ডিএনএ কমবেশি ৯৯% হুবুহু এক। এই জিনোম ক্রম ৯৯% মিলে গেলেও কিন্তু এদের ক্রোমোজোম সংখ্যার পার্থক্য আছে। মানুষের প্রতিটি দেহকোষে আছে ২৩ জোড়ো ক্রোমোজোম কিন্তু বানর প্রজাতির প্রতিটি দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৪ জোড়া। বিবর্তনের কোনো এক মোড়ে আদিম কোনো এপের দুটি ক্রোমোজোম জুড়ে গিয়েছিল। আমাদের ২ নম্বর ক্রোমোজোম হলো সেই জোড়ো ক্রোমোজোম। মানুষের ক্ষেত্রে আদিম কোন বানরের দুটি ক্রোমোজোম জুড়ে গিয়েছিল বলে মানুষের ক্রোমোজোম বানরের থেকে এক জোড়া কম। অর্থাৎ প্রমাণিত হলো শিম্পাঞ্জি ও অন্যান্য বানরেরা মানুষ ও আদিম এক সাধারণ পূর্বসূরী থেকে বিবর্তনের দ্বারা উদ্ভব হয়েছে। কারণ এটাই সত্য বিবর্তনের আধুনিক ধারণা অনুসারে সকল জীবের মধ্যে ডিএনএ বা জিনগত কিছু মিল থাকার কথা। সেই মিল যত কাছাকাছি তত তারা নিকট আত্মীয়। আধুনিক হোমো সেপিয়েন্স মানুষের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেকটাস, হোমো হ্যাবিলিসের, বিশেষ করে হোমো নিন্ডারথ্যালেন্সিসের সঙ্গে মানুষের ডিএনএ প্যাটার্নের বহু অংশে মিল আছে। তা এই প্রাণীদের জীবাশ্মের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে। অথচ আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ডারউইনের কাছে এসব কিছুই ছিল না। তখন প্রাপ্ত কয়েকটি জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ করে তিনি মানুষের বিবর্তন নিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এখন অনেকাংশে সত্য বলে প্রমাণিত। সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই অনুমান করা কতটা কঠিন ছিল তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মানুষের বিবর্তনের ধাপ ঃ

মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বহু যুগ ধরে ক্রম বিবর্তনের ফলে আজ আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষের ক্রম বিবর্তন সম্পর্কিত জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে মানুষের উৎপত্তি ঘটেছিল মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকায়। নিম্নলিখিত ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে।

১. প্যারাপিথেকাস ঃ আজ থেকে প্রায় ৩৫০ লক্ষ বছর আগে অলিগোসিন ইপোকে ইঁদুরের ন্যায় ছোট একদল বানর জাতীয় প্রাণীদের দেখা গিয়েছিল এরা প্যারাপিথেকাস। এরা লম্বায় প্রায় ১ ফুট ছিল। এরা মিশরের কায়ুম অঞ্চলে বাস করত। এ সময় ঐ অঞ্চলের তাপমাত্রা ছিল বর্তমান ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মতো। অলিগোসিন ইপোকের শেষের দিকে এরা লম্বায় প্রায় তিনগুণ বড় হয়। এদের নাম দেওয়া হয় প্রোপিলোপিথেকাস।

২. প্রোপিলোপিথেকাস – মিয়োসিন ইপোকে মিশর থেকে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়। এরা দেখতে সামান্য হলেও গরিলা বা কেউ শিম্পাঞ্জির মতো ছিল। বিভিন্ন স্থানে এদের বিভিন্ন নাম – কেনিয়ায় এদের প্রোকনসাল, ইউরোপে প্লায়োপিথেকাস এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এরা লিমোনোপিথেকাস। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কেনিয়ার রুশিঙ্গা দ্বীপ থেকে প্রোকনসালদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। লুই লিকি ও তার স্ত্রী মেরী লিকি এদের আবিষ্কার করেন। এর জীবাশ্মের করোটির আয়তন ছিল ১০০ ঘন সেন্টিমিটার। এরা গাছের উপরে বসবাস করত। কখনও সমতল

ভূমিতে নেমে আসত। এদের দেহ ঘন লোমে আবৃত ছিল। এরা কুঁজো হয়ে চলা ফেরা করত।

৩. ড্রায়োপিথেকাস – এরা প্রায় ২৫০ লক্ষ বছর আগে মিয়োসিন যুগে বসবাস করত। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিন প্রত্নজীবতত্ত্ববিদ ব্রাউন, গ্রেচারী এবং হেলসেন উত্তর ভারতের শিবালিক অঞ্চল থেকে এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে আফ্রিকা থেকেও এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়েছে। এদের মাথার খুলির ভেতরের আয়তন ১৭৫ ঘন সেন্টিমিটার।

ড্রায়োপিথেকাস থেকে তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। প্রথম শাখা থেকে – গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাং ওটাং। দ্বিতীয় শাখা জাইগান্টো পিথেকাস নামক এপে পরিণত হয়ে এশিয়ার উপত্যকায় বিচরণ করত। বর্তমানে এরা বিলুপ্ত। তৃতীয় শাখা থেকে সৃষ্ট রামাপিথেকাস – যা অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে বর্তমান আধুনিক মানুষ হিসেবে পরিণতি লাভ করে।

৪. রামাপিথেকাস – ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের শিবালিক অঞ্চল থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ২০০ ঘন সেন্টিমিটার। এরা কখনও কখনও বন থেকে বাইরে আসত এবং তৃণভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। এরা তৃণভোজী ও সেই সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ভক্ষণ করত। এরা সর্বপ্রথম মানব সদৃশ প্রাইমেট। এরা মিয়োসিন যুগে ছিল।

৫. অস্ট্রোলোপিথেকাস – দক্ষিণ আফ্রিকার টং অঞ্চল থেকে রেমন্ড ডার্ট নামক একজন প্রত্নতত্ত্বজীববিদ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে জাভা (Java) থেকেও এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়। এদের ৬টি প্রজাতির জীবাশ্ম আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ৩০০-৪৫০ ঘন সেন্টিমিটার। আধুনিক মানবের এক তৃতীয়াংশ। এদের দাঁতের গঠন ও চোয়াল অনেকটা মানুষের মত ছিল এবং আকারে বড় ছিল। এরা খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত এবং পাথর ভেঙে সুঁচালো করে পশু শিকারে ব্যবহার করত। এরা গুহায় বাস করত বলে মনে করা হয়।

৬. হোমো হ্যাবিলিস – জোনাথন লিকি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কেনিয়ার অলদুভাই গর্জ থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। প্রায় ১৭.৫ লক্ষ বছর পূর্বে এরা বসবাস করত। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ৬৭০-৮০০ ঘন সেন্টিমিটার। এদের দাঁতের আকৃতি ও চোয়ালের সংযুক্তি অনেকটা আধুনিক মানুষের মত ছিল। এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। এরা দ্বিপদী ছিল। এরা পাথর দিয়ে যন্ত্রপাতি বানাত এবং কৃত্রিম গুহায় বসবাস করত।

৭. হোমো ইরেকটাস – এরা সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। ইউজেন ডউবইস ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জাভা থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে চীনের পিকিং থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী মায়ার এদের নামকরণ করেন হোমো ইরেকটাস।

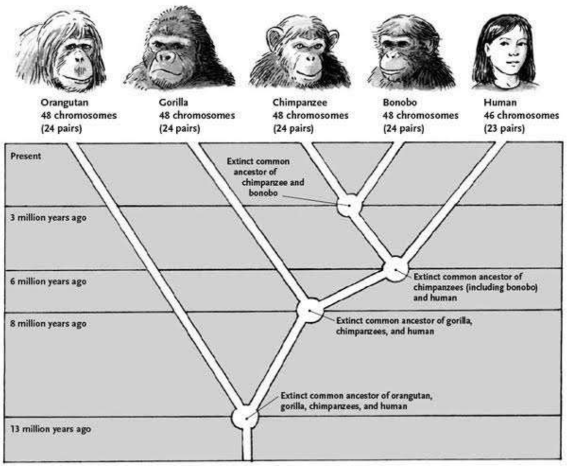

ক) হোমো ইরেকটাস জাভালেনসিস – এরা প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করত। এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৯৪০ ঘন সেন্টিমিটার। উচ্চতা ৫ ফুটের মত এবং ওজন প্রায় ৭০ কেজি। এদের চিবুক ছিল না কিন্তু ভ্রূরেখা ছিল। এদের জাভা মানবও বলা হয়।

খ) হোমো ইরেকটাস পিকিনেনসিস – এরা ৩-৫ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করত। এদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৮৫০-১২০০ ঘন সেন্টিমিটার। এরা আগুনের ব্যবহার জানত। এদের পিকিং মানবও বলা হয়।

৮. হোমো সেপিয়েন্স – হোমো ইরেকটাস বিবর্তিত হয়ে হোমো সেপিয়েন্স এসেছে।

এরা বর্তমান মানব গোষ্ঠীর ঠিক আগের পূর্বপুরুষ বলে গণ্য হয়। এদের করোটির আয়তন বড় এবং হাত মুক্ত রেখে দৌঁড়াতে পারত। এ জীবিকা ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র তৈরি করত এবং সামাজিক জীবন যাপন করত। বাসস্থানের বিচারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ক) হোমো হাইডেলবার্গেনিসিস – ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর হাইডেলবার্গ থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়। মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ৮০০-১২০০ ঘন সেন্টিমিটার। এদের নিয়ান্ডারথাল মানুষের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। এদের হাইডেলবার্গ মানবও বলা হয়।

খ) হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান্ডার্থালেনিসিস – এরা প্রায় ১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আসে ও ২৫ হাজার বছর আগেও এদের অস্তিত্ব ছিল। জার্মানির নিয়ান্ডারথ্যাল উপত্যকায় এদের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এরা এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বিস্তারলাভ করেছিল। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ১৩০০-১৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। এরা লম্বায় ৫ ফুট ১ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত

ছিল। এদের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত ও হাঁটু সামান্য বেঁকে যেত। এরা আগুন জ্বালাত, হাতিয়ার তৈরি করত, গুহায় বসবাস করত এবং কিছুটা সামাজিক জীবন যাপন করত। এরা পোশাক সেলাই করে পড়ত। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থান থেকে এদের জীবাশ্ম আবিষ্কার করা হয়েছে।

গ) ক্রোম্যাগনোন (Cro-Magnon) – এরা ফ্রান্সের উপত্যকায় বসবাসকারী গুহা মানব ছিল। এরা গুহার দেয়ালে চিত্রাঙ্কন করতো। গঠনের দিক দিয়ে এরা আধুনিক মানুষের কাছাকাছি ছিল।

৯. আধুনিক মানব বা হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স – হোমো গণের একমাত্র জীবিত প্রজাতি। এরা বিভিন্ন ভাবে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ১৪৫০-১৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। এরা সামাজিক জটিল জীবন যাপন করে। প্রায় ৩০ হাজার বছর পূর্বে এই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে। ক্রমেই এই সভ্য মানুষের জীবনযাত্রায় উন্নয়ন ঘটেছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের জীবন-যাত্রা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর ও উন্নত হচ্ছে।

তাহলে এই হলো মোটামুটিভাবে মানুষের বিবর্তনের ধারা। আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বানর থেকে কী মানুষের উদ্ভব হয়েছে? আমরা 'বানর' বলতে ঠিক কি বুঝব। যারা এ প্রশ্নটি করেন তাদের অনেকেই ভুলভাবে ভেবে থাকেন যে, জঙ্গলে গাছের ডালে কিংবা চিড়িয়াখানায় খাঁচার রডে ভুলে থাকা আধুনিক বাঁদর (মাঙ্কি) বা শিম্পাঞ্জিগুলো থেকেই বুঝি মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বিবর্তনের স্বপক্ষে অসংখ্য তথ্য প্রমাণ বলছে যে, মানুষ আর পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো অন্যান্য বাঁদর কিংবা এপ'রা অনেক অনেককাল আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তিত হয়েছে এবং আলাদা আলাদা ধারা বা লিনিয়েজ তৈরি করেছে। সে হিসেবে আমরা আধুনিক বানরগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও সরাসরি উত্তরসূরী নই। আমরা আসলে এসেছি বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক ধরনের সাধারণ পূর্বপুরুষ হিসেবে কথিত প্রাইমেট থেকে।

না, মাঙ্কি বা বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়নি, বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষ প্রজাতিরও উদ্ভব ঘটেছে বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক ধরনের কোন সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে। এখানে 'বানর জাতীয়' বলতে প্রাইমেট বোঝানো হচ্ছে, মাঙ্কি নয়। শুধু মানুষই নয়, শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং ওরাং ওটাং-এর মতো প্রাণীকূলেরও উদ্ভব ঘটেছে সেই একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে। বর্তমানে ডারউইনের ব্যাখ্যা মেনে প্রাণের বিকাশ এবং বিবর্তনকে একটা বিশাল গাছের সাথে তুলনা করা যায়। একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তনের ওই গাছটির (জাতিজনি বৃক্ষ) বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। এর কোন শাখায় হয়তো শিম্পাঞ্জির অবস্থান, কোনো শাখায় হয়তো গরিলা আবার কোনো শাখায় হয়ত মানুষ। অর্থাৎ, একসময় তাদের সবার এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিলো, ১.৪ কোটি বছর আগে তাদের থেকে একটি অংশ বিবর্তিত হয়ে ওরাং ওটাং প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তখন, যে কারণেই হোক, এই পূর্বপুরুষের বাকি জনপুঞ্জ নতুন প্রজাতি ওরাং ওটাং এর থেকে প্রজননগতভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং তার ফলে এই দুই প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তাদের নিজস্ব ধারায়। আবার প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে সেই মূল প্রজাতির জনপুঞ্জ থেকে আরেকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পরবর্তীতে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়ে গরিলা প্রজাতির উৎপত্তি ঘটায়। একইভাবে দেখা যায় যে, ৭০ লক্ষ বছর আগে এই সাধারণ পূর্বপুরুষের অংশটি থেকে ভাগ হয়ে হোমো গণের মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির বিবর্তন ঘটে। তারপর এই দুটো প্রজাতি প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন থেকেই একদিকে স্বতন্ত্র গতিতে এবং নিয়মে মানুষের প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে, আর ওদিকে আলাদা হয়ে যাওয়া শিম্পাঞ্জির সেই প্রজাতিটি ভিন্ন গতিতে বিবর্তন হতে হতে আজকের শিম্পাঞ্জিতে এসে পৌঁছেছে। তার মানে বানর বা মাঙ্কি থেকে মানুষের বিবর্তনও হয়নি। কিন্তু প্রাইমেটকে বানরের শব্দার্থ হিসেবে বিবেচনা করলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষও একধরনের প্রাইমেট বা বানর জাতীয় প্রাণী ছাড়া কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মাঙ্কি একটি অধিবর্গ বা প্যারাফাইলেটিক গ্রুপ, আধুনিক ফাইলোজেনেটিক্সে প্যারাফাইলেটিক গ্রুপ শক্তভাবে এড়িয়ে চলা হয়। আমরা কোন মাঙ্কি অবশ্যই নই, তবে অবশ্যই অবশ্যই আমরা প্রাইমেট। আমাদের পাশাপাশি অবস্থিত একজোড়া চোখ, ত্রিমাত্রিক, রঙ্গীন, Stereoscopic দৃষ্টি, চোখের পেছনে বিশাল বড় একটা মাথা, ২৫০ দিনের কাছাকাছি গর্ভকালীন সময়, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বে একটা অস্বাভাবিক রকম বিশাল শৈশব, ল্যাটেরাল থেকে ক্রমান্বয়ে স্ক্যাপুলার ডোর্সাল অক্ষে পিছিয়ে যাওয়া (regression), পেন্ডুলার পেনিস এবং স্ক্রোটামে থাকা টেস্টিস, অস্বাভাবিক বিকাশপ্রাপ্ত প্রাইমারি সেন্সরি কর্টেক্স আমাদের বানর জাতীয় জীব বা প্রাইমেট করেছে তা আমরা স্বীকার করি বা না করি। মানুষ সহ সব বনমানুষই বা এপ'রা স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্গত প্রাইমেট বর্গে পড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাইমেটদের দু'শরও বেশি প্রজাতির সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। মানুষকে এই প্রাইমেট বর্গের মধ্যে হোমিনিডি অধিগোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

আগেই বলেছি খোদ চার্লস ডারউইনকেও এসব কথা লেখার জন্য বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল, তাঁকে নিয়ে বানরের আদলে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন আঁকা হয়েছিল। অপমানিত হতে হয়েছিল বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলিকে। অক্সফোর্ডে এক সভায় তাঁকে হেনস্তা করার জন্য এক খ্রিষ্টান বিশপ জানতে চান তার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার মধ্যে কে

বানর ছিলেন। বিশপ প্রবর মোক্ষব জবাব পেয়েছিলেন হাক্সলির বুদ্ধিদীপ্ত তীর্যক উত্তরে। ঘটনাটি এরকম ঃ

একবার অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সম্মেলনে বিবর্তনের তীব্র বিরোধিতাকারী খ্রিষ্টান ধর্ম বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের তত্ত্বকে ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিগত মতামত বলে আক্রমণ করেন। তখনই তিনি হঠাৎ করে সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী হাক্সলিকে উদ্দেশ্য করে জানতে চান তার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার মধ্যে কে আসলে বানর ছিলেন। তারই উত্তরে হাক্সলি বিবর্তনবাদের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বিশপকে কুপোকাত করে ছাড়েনই আর বক্তৃতার শেষে এসে তিনি এও বলেন যে, 'যে ব্যক্তি তার মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন ও বাগ্মিতাকে কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার উত্তরসুরী না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসূরী হতে চাইব যারা গাছে গাছে বাস করে, যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেক ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।'

এপ'দের ও মানুষের বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মাঙ্কি থেকে আমরা বিবর্তিত না হলেও বানর জাতীয় সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের মানুষ প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে এটা মোটেই ভুল নয়। সাধারণ পূর্বপুরুষ নাম দেওয়া হোক আর যাই হোক – তারা যে আসলে বানর সদৃশ জীবই ছিলো তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, আমরা সবাই সার্বিকভাবে প্রাইমেটদেরই গোত্রভুক্ত। এ প্রসঙ্গে মার্কিন জীবাশ্মবিদ জর্জ গেলার্ড সিম্পসন বলেছেন – কৈফিয়তদাতারা খুব জোরালো ভাবে বলে থাকেন যে, কোন জীবিত এপ থেকে মানুষের উদ্ভব হয়নি। এটি প্রায় নির্বোধের মত কথা। এর অর্থ এই যে, মানুষ কোন প্রকার বানর বা এপ থেকে উদ্ভূত হয়নি, বরং একটি কমন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ব্যাপারটা ভুল নয়। কিন্তু তারপরেও বাস্তবতা হল – কেউ যদি আজ সেই 'সাধারণ পূর্বপুরুষ'কে দেখতে পেত তাহলে (দৈহিক এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিচার করে) অবশ্যই তাকে এপ বা বানর নামেই অভিহিত করতো। ■

মানুষের বিবর্তন নিয়ে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ২০২২ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞান বা শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সভান্তে প্যাবো। তিনি মানব বিবর্তন আবিষ্কারের এক অসম্ভব কীর্তি সম্পাদন করেছেন। তিনি নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষের জিনোমের অনুক্রম নির্ণয় করেছেন, যারা ছিল আধুনিক মানুষের আদিপুরুষের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু বিলুপ্ত এক মানব প্রজাতি। এছাড়া তিনি সম্পূর্ণ অজানা এক ধরনের মানুষের প্রজাতি আবিষ্কার করেন, যাদের ডেনিসোভান মানব বলা হচ্ছে। কারণ এটি রাশিয়ার ডেনিসোভা গুহায় পাওয়া গিয়েছিল। প্যাবো দেখাতে সক্ষম হয়েছেন আজ থেকে প্রায় ৭০হাজার বছর আগে এইসব বিলুপ্ত হোমিনিনদের থেকে আধুনিক হোমো সেপিয়েন্স মানুষের জিন হস্তান্তর হয়েছিল, যে সময় হোমো সেপিয়েন্স আফ্রিকা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিবাসী হওয়া শুরু করেছিল।

●সম্পাদকীয়'র শেষাংশ

'কারাগার' থেকে মুক্তি কোন পথে?

পাল্টেছে বলে ঘোষণা হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইসরায়েলের সাথে সৌদি আরবের সমঝোতা সূত্র বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দ্বিরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্থায়ী সমাধানের মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণের প্রস্তাব এসেছে। সমগ্র বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই বর্বর হামলাকে ধিক্কার জানাচ্ছে।

এই মুহূর্তে কোণঠাসা হতে হতে ফিলিস্তিনিরা মাত্র দুটো ভূখন্ডে জড়ো হয়েছেন, যাকে তাঁদের স্বদেশ বলুন আর কারাগার, যাই বলুন। এমনই এক ভূখন্ড গাজাতে সাম্প্রতিক অমানবিক ধ্বংসলীলা দেখে কোনো সুস্থ মানুষই স্থির থাকতে পারেন না। এমনকি ইসরায়েলের বহু নাগরিক স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ করছেন এই গণহত্যার। ইসরায়েল ভূখন্ডে আরবী শ্রমিকদের কোন কাজে নেওয়া হবে না এটা ইসরায়েল সরকার ঘোষণার করে ভারত থেকে ১ লক্ষ শ্রমিক পাঠানোর আহ্বান করেছে। খবরে প্রকাশ ভারত সরকার এতে রাজী হয়ে তার প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তাই কার্যত এই কারাগারের বন্দীদের পাশে কেউ নেই।

দ্বিরাষ্ট্র তত্ত্ব ফিলিস্তিনিদের জোর করে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে, নিকেশ করার নীতি। এই নীতি শুধু জায়নবাদীদের নয়, এদের পিছনে থাকা ধনকুবেরদের জঘন্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেই কারণে প্রতিবাদী প্রতিটি ফিলিস্তিনির জন্য এই লড়াই কারাগার থেকে মুক্তির লড়াই। জোর জবরদস্তি কোন মানব গোষ্ঠীকে আটকে রাখা বা বিতাড়ন কখনো সমর্থন যোগ্য নয়। তাই এই আত্মরক্ষার নামে নিরীহ মানুষের গণহত্যাকে আমরা ধিক্কার জানাই। পাশাপাশি একথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইসলামী মৌলবাদ দ্বারা এই জায়নবাদী আগ্রাসনকে রুখে দেওয়া যাবে না। ইসরায়েল এবং কারাগার স্বরূপ ফিলিস্তিনের আরব ও হিব্রুভাষী শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামই এই অন্যায় হামলার অবসান করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ■

বিশেষ রচনা ঃ

‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সত্বেও জনস্বার্থে প্রয়োগে বাধা কোথায় এবং সমাধানই বা কি?

[এবছর অক্টোবর বিপ্লব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে রচিত – সম্পাদক।]

মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যে এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রমের ফলে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। পাথরের অস্ত্র ছিল প্রযুক্তির প্রথম ব্যবহার। এরপর একে একে অসংখ্য প্রযুক্তি ও প্রকৌশল প্রকৃতির অবিরাম পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। বস্তুজগতের উপর এই প্রযুক্তির ব্যবহার বস্তুজগতের পরিবর্তনকে দ্রুত করেছে। ফলে বস্তুর নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সহজতর হয়েছে। এইভাবেই বলা যায় উৎপাদনের বিকাশের পথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

উৎপাদিকা শক্তির বিকাশেই আদিম সাম্যবাদী মানব সমাজ দাস সমাজে এবং দাস সমাজ সামন্ত সমাজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দাসযুগের শেষে এবং সামন্ত যুগে বিজ্ঞান ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসীর মতো। প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারকারী বিজ্ঞানের সাধকরা বারংবার ধর্মবাদীদের রোষানলের শিকার হয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের আগমণের ফলে বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে। সেই বিদ্রোহে পুঁজিপতিশ্রেণী যোগ দিল তার স্বার্থে।

‘আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন।’ পুঁজিবাদ তার বিকাশের স্বার্থে পূর্বেকার অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষঙ্গিক সকল সনাতন শ্রদ্ধাভারাক্রান্ত কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল। নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়াল, প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য ব্যবস্থাকে এক বিশ্বজনীন চরিত্র দান করল।

মহান সমাজ বিজ্ঞানীদের পুঁজিবাদ সম্পর্কে এই মূল্যায়ন আজও আমাদের কাছে জীবন্ত।

পুঁজিবাদের আগমণের ফলে বিজ্ঞান অতীত যুগ থেকে কতটা উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পুঁজিবাদের আগমণের প্রাক্কালে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস কঠিন বস্তুর ভাসমানতার শর্ত হিসাবে প্লবতাকে আবিষ্কার করেন। অথচ প্লবতা একপ্রকার বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলের সংজ্ঞা, তার পরিমাপের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানী নিউটনের গতিসূত্র থেকে আমরা পেলাম বলের সংজ্ঞা, তাকে পরিমাপের নিয়ম ইত্যাদি।

পৃথিবীর সকল দেশেই পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমান্বয়ে উন্নতি বর্তমানে এক অভাবনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতেও ইউরোপীয় পুঁজিবাদের হাত ধরে এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে নানা বাধা অতিক্রম করে। মধ্যযুগে বর্ণাশ্রম প্রথা ও ধর্মবাদ এদেশে বিজ্ঞানের বিকাশে এক বিরাট বাধা হিসেবে বিরাজ করেছে। ইউরোপে যেমন মধ্যযুগে বিজ্ঞান গির্জার সেবাদাসী ছিল এদেশেও তেমনই বিজ্ঞান চর্চা ধর্মবাদ ও মনুবাদের জালে জড়িয়ে গেছিল। সুশ্রুতের মত শল্যচিকিৎসাবিদ এবং জৈবরসায়নসহ নানা শাখার বিজ্ঞানীরা মনুবাদী তথা ধর্মবাদীদের শিকার হয়েছেন।

একসময় বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে বিজ্ঞান সাধকদের ব্যক্তিগত মণিষার দ্বারা। কিন্তু পুঁজিবাদ যতই বিকশিত হয়েছে ততই বিজ্ঞানও হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক এবং যৌথ প্রয়াসের বিষয়।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরিবর্তকালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসনকালের প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান গবেষণায় রাষ্ট্র তেমন উৎসাহ দেয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পর ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও সহযোগী ভারতীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগে পুঁজিবাদের বিকাশের মাত্রাবৃদ্ধি পায়। ১৯২০-৩০ পর্যায়ে এক ঝাঁক ভারতীয় বিজ্ঞানী সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সিএসআইআর গড়ে ওঠে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ১৯৫১-তে খড়গপুরে প্রথম আইআইটি গড়ে ওঠে। ১৯৫৯-এ টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রথম স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার তৈরি করে। ১৯৮২ থেকে সারা দেশে টেলিভিশন সম্প্রচার হয়। ধীরে ধীরে সারা দেশে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয়। ১৯৬৭-তে বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে দেশের কৃষিক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটে। ১৯৭০-এ দুগ্ধ উৎপাদনে প্লাবনের সূচনা হয়। ১৯৭৯-তে মহাকাশে ভাস্কর-১ উৎক্ষেপণ হয়। ২০০৮- ইসরো প্রথম চন্দ্রযান উৎক্ষেপণ করে এবং ২০২৩ মঙ্গলযান চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করে ইত্যাদি।

আজ একথা সকলেই স্বীকার করে নেবেন যে বর্তমান যুগ হল

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগ। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে মহাকাশ গবেষণা, কৃষি উৎপাদন থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে যন্ত্রশাসনের সাহায্যে সব কাজ করানো; আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে সমুদ্রতলে স্থাপত্য নির্মাণ – আজ সবই বাস্তব।

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নতির সুফল কি ভারত ও বিশ্বের আপামর শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে? বিজ্ঞানের প্রযুক্তির অগ্রগতি কি জনস্বার্থে বিকশিত হয়ে চলেছে?

আমরা জানি বিজ্ঞান শ্রেণীনিরপেক্ষ, কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী এবং প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের দ্বারা যে বিপুল সম্পত্তির ও জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে তার সবই আজ মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর কুক্ষিগত। বিশ্বের অতি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের (একশত-র কম) হাতে সমগ্র বিশ্বের ৭০০ কোটি জনতার শ্রমের সিংহভাগ ফসল। ভারতের ১ শতাংশ পুঁজির মালিকদের হাতে রয়েছে দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ। ভারতের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের দৈনিক আয় ৩৩ টাকারও কম। রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে বিশ্বে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ২০০০ কোটি টন খাদ্য সামগ্রি গুদামে পচে নষ্ট হচ্ছে অথচ বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ চরম অপুষ্টিতে ভুগছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ঔষধের আবিষ্কার হলেও অল্প আয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তা আয়ত্তের বাইরে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীর সন্তান সাক্ষর হওয়ার পর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সারাবিশ্বে উন্নত প্রযুক্তির সুউচ্চ বহুতল এবং বিলাসবহুল বাড়ি তৈরি হচ্ছে অথচ গরীব ও মধ্যবিত্তের একাংশ আজও উপযুক্ত বাসস্থান থেকে বঞ্চিত। ফুটপাতবাসী বাড়ছে। পুঁজিবাদের বিকাশ দেশে অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন করছে এবং আজ প্রায় সারা দেশে বিদ্যুতায়ন হয়েছে অথচ চড়াদামে বিদ্যুৎ কিনতে অক্ষম মানুষ বিদ্যুতের লাইন সচল রাখতে ক্রমশ অক্ষম থেকে অক্ষমতর হয়ে উঠছেন। বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলি যেমন চাঁদে পদার্পণ, মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব, কিডনি-হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন সত্ত্বেও, চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার সত্ত্বেও বিজ্ঞানের সুফল থেকে বঞ্চিত অধিকাংশ মানুষ আজও অলৌকিকবাদ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এক নয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যদি বর্তমানের শতগুণও বিকশিত হয়, সকল মারণ রোগের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, মানুষ চাঁদ কিংবা অন্য গ্রহ উপগ্রহে বসবাসের ব্যবস্থাও করে ফেলে তবে কি শ্রমজীবী জনগণ মানুষের মত বাঁচতে পারবে? সকল কুসংস্কার ও অন্ধকার দূর হয়ে যাবে? আদৌ নয়। কারণ বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত। এই ব্যবস্থায় কার্যত সকল সম্পদের মালিকশ্রেণী অর্থাৎ দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর সকল ক্রিয়াকলাপের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মুনাফা, আরও মুনাফা। বর্তমানে আমরা এটা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রধান শিকার বিশ্বের মেহনতী জনতা। প্রযুক্তির যত উন্নতি হয় তা শ্রমজীবীদের শ্রমলাঘব না করে তাঁদের এই সমাজে নিঃস্ব ও ব্রাত্য করে তোলে। তা বলে কি আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের বিরোধিতা করব? সমগ্র মানব সমাজের বিকাশের স্বার্থের সমাজ ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই এই বৈপরীত্যের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র মানব সমাজের বিকাশকে শত সহস্রগুণ এগিয়ে দিতে পারে। জনস্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সকল বাধা অপসারিত করতে পারে।

এই বক্তব্য বৈজ্ঞানিকতাকে সত্য এবং মহান সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম দিয়েছিলেন পুঁজিবাদের গর্ভে ক্রমশ বিকশিত হয়ে চলা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভ্রূণকে দেখতে পেয়ে। এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে আজও শত চেষ্টা করেও কেউ খন্ডন করতে পারে নি। আর পৃথিবীর বুকে এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সফল রূপায়ণও মানবজাতি প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বুকে সংঘটিত সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর বুকে প্রথম এই অসাম্য ও বৈষম্যের অবসানের সূচনা করে।

এই সমাজ বিপ্লবই প্রথম রাশিয়া তথা সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে মানব কল্যাণের এবং একমাত্র মানবজাতির কল্যাণে বিকশিত করেছিল। দূর করে দিয়েছিল জনস্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সকল বাধা। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে এই সুমহান কার্যকলাপকে তুলে ধরব।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জনস্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ

পশ্চিম ইউরোপের মত জারশাসিত সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় বিজ্ঞান গির্জার দাসত্ব করত। বিজ্ঞানের বিকাশে রাষ্ট্র ছিল উদাসীন এবং যে উদ্ভাবন ও আবিষ্কার জারতান্ত্রিক শাসনের বিরোধী প্রবণতার জন্ম দিত তাকে কোন প্রশ্রয় দেওয়া হত না। ডারউইনের বিবর্তনবাদের মত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপাঠ ছিল কার্যত নিষিদ্ধ। একমাত্র জার প্রথম পিটারের শাসনকালে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিছুমাত্র ভূমিকা নেয়। প্রথম পিটারের পরে দ্বিতীয় ক্যাথরিনের কাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা কিছুটা বাহিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী রাশিয়া ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের যান্ত্রিক যোগফল ছাড়া কিছু নয়। বিজ্ঞানের আধিকারিকরা (বর্তমানে

এদেশের মত) ছিলেন সংকীর্ণ চিন্তার ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর চাটুকার। রাজকর্মচারীরা ছিল (বর্তমানে এদেশের মত) ঘুষখোর ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। বিজ্ঞানের সাধকরা এক চরম নৈরাশ্যের বাতাবরণের মধ্যে ছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের কয়েক বছর আগে রাশিয়ায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী পি এন লেবেদেভ তাঁর বন্ধু বিজ্ঞানী গোলিটসিনকে এক চিঠিতে লেখেন – 'মাতৃভূমির জন্য বিজ্ঞান গবেষণায় আমার সকল প্রয়াস আজ অযথা সময়ের অপচয়ে পরিণত হয়েছে। আমি অনুভব করছি যে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, যেখান থেকে আমার পরিত্রাণ নেই'।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষে প্রবীণ রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়ের হতাশাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের ক্ষোভ উগরে দেন। অসংখ্য অধ্যাপকরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এই সময় বিজ্ঞানী লেবেদেভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে মস্কোর এক বেসমেন্টে গবেষণাগার তৈরি করেন। এখানেই তিনি তাঁর শেষ গবেষণা 'টেরেস্টেরিয়াল ম্যাগনেটিজম' নিয়ে শেষ গবেষণা করেন। বিজ্ঞানী এস আই ভ্যাভিলভ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই মার্চ বিজ্ঞানী লেভেদেভ-এর মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করেন 'এতে সন্দেহ নেই যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যাজেডির কারণে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ বলশেভিক পার্টি যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার ডাক দেয় তখন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একপক্ষ সরকারের আহ্বানে যুদ্ধের প্রয়োজনে গ্যাস মাস্ক, এক্স-রে মেশিন, টেলিফোন প্রযুক্তির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন আবার অপরপক্ষ (সিংহভাগ) জারশাসনের বিরোধিতায় নেমেছেন নানাভাবে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর (নতুন ক্যালেন্ডার অনুসারে ৭ই নভেম্বর) রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও গরীব কৃষক দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারশ্রেণীকে উৎখাত করে পৃথিবীর বুকে প্রথম শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতীদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

সোভিয়েত শাসনের প্রথম দশক কেটেছে গৃহযুদ্ধ এবং বহিঃআক্রমণ ও তার প্রতিরোধে। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্হিবিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান তথা সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা শ্রমিকশ্রেণীর এই শিশু রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বিকাশের স্বার্থে লেনিন বলেছিলেন 'আমাদের অবশ্যই পুঁজিবাদের পিছনে ফেলে যাওয়া সকল প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে হবে এবং এটা দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই পুঁজিবাদের সকল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে, সকল জ্ঞান ও শিল্পকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা কমিউনিস্ট সমাজ গড়তে পারবো না ...'

সোভিয়েত সরকার জমির মালিকানায় সামাজিকীকরণ ঘটিয়ে, চার্চ ও মঠের সকল সম্পত্তির দখল নিয়ে, ব্যাঙ্কসহ সকল বৃহৎ পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করে, জনশিক্ষা কমিশনের দায়িত্বে সর্বজনীন সাক্ষরতার কর্মসূচি নিয়ে, স্কুলগুলিকে বিকেন্দ্রীকরণ করে এক সমাজবাদী সমাজের স্থাপনার লক্ষ্যে দ্রুত তৎপরতা শুরু করে।

দেশজুড়ে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়া বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বিশ্বব্যাপী তাদের বন্ধুরা যখন শ্রমিকশ্রেণীর এই শিশু রাষ্ট্রকে শুরুতেই গলা টিপে মারার নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতেই উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শুরু হয় এবং দেশের প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রকে সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলির সাথে সম্পর্কিত করা শুরু হয় যেমন ফিজিকো টেকনিক্যাল হাইড্রো ডায়ানামিক ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কারখানাগুলির, অল ইউনিয়ন ইলেক্ট্রো টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের। বিদ্যুৎ গতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সব থেকে বেশি জোর দিতে হবে – বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা ভি আই লেনিনের এই ছিল ভাবনা। তিনি বলতেন সমাজতন্ত্র = সোভিয়েত + বিদ্যুৎ।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞানের প্রখ্যাত লেখক এইচ জি ওয়েলস রাশিয়াতে এসেছিলেন এবং লেনিনের সাক্ষাৎকার নেন। ভি আই লেনিন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে "লেনিন একজন ইউটোপিয়ানদের কড়া সমালোচক হয়েও আদপে নিজেই ইউটোপিয়া (কল্পনা)-য় আচ্ছন্ন। তিনি ছিলেন ইলেকট্রিসিয়ান ইউটোপিয়ান যিনি সারা রাশিয়ায় আলো, পরিবহন এবং শিল্পের জন্য শক্তি সরবরাহ করতে চান। এসব কল্পনা ইংলন্ড, হল্যান্ডের মত শিল্পোন্নত দেশগুলিই করতে পারে। কিন্তু শিল্পে পিছিয়ে পড়া রাশিয়ায় এই পরিকল্পনা কাল্পনিক। এই ছোটখাট মানুষটি রাশিয়ার ক্ষয়িষ্ণু রেলপথকে একটি বৈদ্যুতিক পরিবহন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া নতুন রাস্তার স্বপ্ন দেখেন, একটি নতুন ও সুখী কমিউনিস্ট শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখেন। আমি যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলেন।"

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এইচ জি ওয়েলস পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে দেখেন একজন কল্পবিজ্ঞানের লেখকের কল্পনাকে হার মানিয়ে কি অত্যাশ্চর্যভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈদ্যুতিক বিকাশ সম্পন্ন করেছে!

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও শিল্প বিকাশ সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করে এসে লেখেন "ইনস্টিটিউট অফ এনারজেটিক্স হল একটি খুব

অপ্রচলিত ধরনের গবেষণাকেন্দ্র। এর মত প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে পাওয়া খুবই মুশকিল, যদিও এর বাইরে বহু দেশে একই কাজের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বলশেভিকরা পুরানো ব্যবস্থার দাসসুলভ অনুকরণকারী নয় এবং তারা কখনওই সাহসী উদ্ভাবনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত নয়। তারা এর জন্য পরিস্থিতি যা দাবি করে তার সবটাই করতে প্রস্তুত।"

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতিকে এমনভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় সব থেকে কম হয়। এর জন্য শুরু হয় অপ্রচলিত শক্তি, অপ্রচলিত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং এমন ধরনের পণ্য উৎপাদন যা নিছক ফ্যান্সি এবং অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার্য না হয়ে বহুকাল ব্যবহার করা যায়। মুনাফার বদলে মানুষের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে জলবিদ্যুৎ, উইন্ড মিল ইত্যাদি অপ্রচলিত শক্তির বিপুল ব্যবহার শুরু হয়। নিম্নমানের আকরিক (যেমন লৌহ আকরিক হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইটের বদলে ল্যাটেরাইট যা এদেশে আজও মোরামের রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার হয়) ব্যবহার, নিম্নমানের জ্বালানি (বিটুনিমাস বা অ্যানথ্রেসাইট এর বদলে সবথেকে নিম্নমানের কয়লা পিট-এদেশে যাকে ঘেঁস বলে) ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করে।

কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উৎপাদনের ধীরে ধীরে অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় এবং যৌথ সমবায় মালিকানায় ফার্ম গঠন করে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো হয়েছিল। উৎপাদন বেড়েছিল প্রায় শতগুণ।

শিল্প, কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ১৫০ বছরে উৎপাদনের যে বিকাশ ঘটিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদী রাষ্ট্র মাত্র ৩০ বছরেই তাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মহামন্দায় সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বের উৎপাদন যেখানে তলানিতে এসে ঠেকেছিল সেখানে বিশ্বের প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রে সেই মন্দার কোন ছাপ তো পড়েই নি, উল্টে তার বিকাশ অতি উচ্চমাত্রায় ঘটেছিল।

ক্ষমতা দখলের পরদিনই সোভিয়েত সরকার ডিক্রি জারি করে ঘোষণা করে বলেছিল যে সমস্ত জনশূন্য বাসা দখলের অধিকার দেওয়া হল স্বাধীন পৌর স্বশাসন সংস্থাগুলিকে। যে সব নাগরিকের থাকার সুযোগ নেই অথবা ঘেঁসাঘেসি করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকেন, তাদের খালি বাসাগুলিতে থাকার আইনী অধিকার দেওয়া হল। দুই দশকের মধ্যে প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

সম্পূর্ণ নিখরচায় সর্বাধুনিক চিকিৎসা প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তির আপাতকালীন চিকিৎসা করে তাঁকে বাঁচানো, মহামারি প্রতিরোধ, সকলের জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করার ব্রত নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর বুকে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে তার অতি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায় কানাডিয়ান সাংবাদিক ডাইসন কার্টার এর মত অসংখ্য সাংবাদিকের রচনায়। দূষণমুক্ত জল সরবরাহ, যৌন রোগগুলির অবসান, মা ও শিশুদের পরিচর্যা বিনামূল্যে সরবরাহ করায় ইতিহাস গড়ে গেছে এই সমাজবাদী রাষ্ট্র।

অত্যাশ্চর্যভাবে বেশ্যাবৃত্তির নির্মূলীকরণ এবং দেহ পসারিণীদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণে, মদ্যপান নিয়ন্ত্রণে সমাজবাদী রাষ্ট্র সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বকে স্তম্ভিত করে গেছে।

পুস্তক প্রকাশনায় বাধাহীন উদ্যোগ এবং ব্যারাইট খনিজ ব্যবহার করে তৈরি কাগজে কমপক্ষে শতাধিক বছর টেকসই পুস্তক প্রকাশ করেছে এই সমাজবাদী রাষ্ট্র বিনামূল্যে বা অতি স্বল্পমূল্যে। যা আজও পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের ঘরে পাওয়া যাবে।

দেশ থেকে বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির মত ব্যাধি চিরকালের জন্য নির্মূল করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিস্মিত করেছে।

নারীমুক্তি প্রশ্নে সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়ন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে মানব সমাজের কাছে। লেনিন বলতেন নারীমুক্তি তখনই সম্ভব যখন দেশের নারীদের শিশু প্রতিপালন ও রান্নাঘর থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে। এই নীতি অনুসারে প্রতিটি নারী তার কর্মক্ষেত্রে বিনামূল্যে শিশুদের ক্রেসে সন্তানকে রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছেন। প্রতিটি মহল্লার কমিউনিটি কিচেনে খাওয়ার বন্দোবস্ত সোভিয়েত নারীর মুক্তি ঘটায়।

এই প্রগতির বিবরণের শেষ নেই। তথ্য দিয়ে বক্তব্যকে তাই আর ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে এই সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যকলাপ দেখে বলেছিলেন যে স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা বোধ হয় এখানেই আছে।

এখন প্রশ্ন হল অতি পিছিয়ে পড়া রাশিয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সুবিপুল উন্নতির কারণ কি? এক কথায় এর জবাব হল – মুনাফার লক্ষ্যে পুঁজিবাদী উন্নয়ন নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলি সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে বিতরণ। সমাজবাদ মুনাফা নয়, জনস্বার্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়। মানুষের কল্যাণই তার একমাত্র ব্রত। মহান সমাজবাদী অক্টোবর বিপ্লব দুনিয়ার জনতাকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছে। তাই আসুন অক্টোবর বিপ্লবের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরি। ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ

বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন

– পঞ্চানন মণ্ডল

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে হল তা নিয়ে রাসায়নিক মতবাদ দেওয়ার জন্য আলেকজান্ডার ওপারিন ও জে. বি. এস. হ্যালডেন-এর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আলেকজান্ডার ওপারিন একজন রাশিয়ান জৈব রসায়নবিদ। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছেন মূলত পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির তত্ত্বে অবদানের জন্য, বিশেষ করে কার্বন-ভিত্তিক অণু থেকে জীবনের বিবর্তনের "প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপ" তত্ত্বের জন্য। এছাড়া ওপারিন এর জৈব রসায়নে উৎসেচক নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান আছে। তিনি সেইসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পের ক্ষেত্রে জৈব রসায়নের ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে অনেকে "বিংশ শতকের ডারউইন" বলে থাকেন।

আলেকজান্ডার ইভানোভিচ ওপারিন রাশিয়ার উগ্লিচে ২ মার্চ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন নয় বছর, তখন তার পরিবার মস্কোতে চলে আসে কারণ তাদের গ্রামে কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। তিনি মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে মস্কো সেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেইসময় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ শারীরবিদ্যায় বিভাগীয় প্রধান ছিলেন রাশিয়ান উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানী কে. এ. টিমিরিয়াজেভ। এই খ্যাতনামা অধ্যাপকের দ্বারা ওপারিন যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রফেসর টিমিরিয়াজেভ ইংরেজ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনকেও চিনতেন। ডারউইনের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর থেকে ওপারিন অনেক কিছু জেনেছিলেন। ডারউইনের কাজকর্ম ওপারিনের পরবর্তী জীবনে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর পোস্ট ডক্টরাল দিনগুলিতে এ এন বাখ দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন যিনি অক্টোবর বিপ্লবকালীন দেশ ছেড়ে চলে গেলেও পরে ফিরে আসেন।

ওপারিন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হন। মাত্র ১০ বছর পর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক পদে কাজ পান। এর মাঝে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রাসায়নিক বটানিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ওপারিন তার প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে এক সাড়া জাগানো তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি তাঁর তত্ত্বে বললেন পৃথিবীতে জীবন একটি "প্রাইমর্ডিয়াল স্যুপে" কার্বন-ভিত্তিক অণুর ক্রমান্বয়ে রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।এর কয়েক বছর পর ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন স্বাধীনভাবে একটি অনুরূপ তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন।

ওপারিন প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছিলেন –

১. একটি জীবিত জীব এবং মৃত জীবের মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয় ও বৈশিষ্ট্যের জটিল সংমিশ্রণ বস্তুর বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জীবনের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই উদ্ভূত হয়েছে।

২. আদিম পৃথিবীতে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প ধারণ করে এমন একটি তীব্র বিজারক বায়ুমণ্ডল ছিল, আর তা ছিল জীবনের আবির্ভাবের কাঁচামাল।

৩. সরল অণু থেকে জটিল বৃহৎ অণু তৈরি হওয়া ও তাদের জটিলতা বা কমপ্লেক্সিটি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি হয়। সেই অণুগুলির স্থানিক বিন্যাস এবং পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত সরল জৈব রাসায়নিক সম্পর্কের উপর একটি নতুন কলয়ডাল-রাসায়নিক নির্দেশ আরোপিত হয়েছিল।

৪. এমনকি জীব সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন বস্তুগত সংগঠনের রূপ নির্ধারণ করেছিল যা পরবর্তীতে জীবের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

৫. জীবন্ত জীবরা হল এক উন্মুক্ত ব্যবস্থা। তাই তাদের অবশ্যই বাইরে থেকে শক্তি ও উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। তাই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা তারা সীমাবদ্ধ নয় (এটি শুধুমাত্র আবদ্ধ সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে শক্তি পুনরায় পূরণ করা হয় না)।

➔

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ

বিজ্ঞানী জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন

বিজ্ঞানী জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন বিশ্বজুড়ে জে. বি. এস. হ্যালডেন নামেই স্বনামধন্য। তাঁর জন্ম হয়েছিল ইংলন্ডের অক্সফোর্ডে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বাবা জন স্কট হ্যালডেন ছিলেন শারীরবিদ্যার গবেষক ও বিজ্ঞানী। তাঁর মা লুইসা ক্যাথলিন হ্যালডেনও ছিলেন সংস্কারমুক্ত মানুষ। তাঁদের দু'জনেরই কোনো প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল না। জে. বি. এস. হ্যালডেন লিখেছেন 'আমি আমার বিজ্ঞান শিক্ষার বেশিরভাগটাই পেয়েছি বাবার শিক্ষানবীশ হিসেবে, আট বছর বয়স থেকে বাবাকে সহায়তা করতে গিয়ে এবং আমার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ছিল ক্লাসিকগুলির উপর, বিজ্ঞানে নয়।' আবার লিখেছেন "শৈশবস্থায় আমি কোনো ধর্মীয় পরিবেশে বড় হইনি। বরং বড় হয়েছি বিজ্ঞান এবং দর্শনের আবহে, যা কিনা আমার বিশ্বাস গড়ে তুলেছে। কৈশোর বয়স থেকেই সমসাময়িক সমস্ত চিন্তা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছি। সে কারণে আজকে আইনস্টাইনকে দুর্বোধ্য মনে হয় না। ... যুব বয়সে আমাকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে এবং মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিখতে হয়েছে, যে অবস্থার মধ্য

➔

●বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ওপারিন

ওপারিন দেখিয়েছেন কীভাবে দ্রবণে জৈব রাসায়নিকগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ড্রপলেটস এবং স্তর তৈরি করতে পারে। তিনি এমন একটি পদ্ধতির রূপরেখা দিয়েছেন যাতে মৌলিক জৈব রাসায়নিকগুলি আণুবীক্ষণিক স্থানীয় সিস্টেমে (কোষের সম্ভাব্য অগ্রদূত) গঠন করতে পারে যেখান থেকে আদিম জীবিত বস্তুর বিকাশ ঘটতে পারে। তিনি বলেছিলেন পৃথিবীর আদিম সাগরে বিভিন্ন ধরনের কোয়াসার্ভেট তৈরি হতে পারে যা পরবর্তীকালে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবনকে বিকশিত করে।

তিনি কার্যকরভাবে চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে জীবন সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য প্রসারিত করেছিলেন। কীভাবে সাধারণ জৈব এবং অজৈব পদার্থগুলি আরও জটিল জৈব যৌগ তৈরি করতে পারে বা মিলিত হতে পারে, যা পরবর্তীতে আদিম জীব সৃষ্টি করতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন জীবন সহজ থেকে জটিল স্ব-সদৃশ জৈব যৌগের বিকাশের মাধ্যমে হয়েছে। যা হঠাৎ কার্যকরভাবে বিকশিত হয়েছিল। তাঁর তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর এবং হ্যালডেনের তত্ত্ব পরীক্ষামূলক সমর্থন পেয়েছে (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরে-এর ঐতিহাসিক পরীক্ষা) এবং বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মিলারের মৃত্যুর পর বিজ্ঞানীরা সেই সময়কার সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মূল পরীক্ষা থেকে সিল করা শিশিগুলি পরীক্ষা করেন এবং প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত রিপোর্টের চেয়ে আরও বেশি সংখ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড সনাক্ত করেন এবং প্রকৃতিতে পাওয়া গেছে যতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড, তার থেকে বেশি অ্যামিনো অ্যাসিড খুঁজে পান। এই মিলার ইউরে এক্সপেরিমেন্টের সাম্প্রতিকতম যাচাই আরও নিশ্চিত করেছে ওপারিন-হ্যালডেন তত্ত্বকে (সূত্র ঃ দ্য হিন্দু দৈনিক পত্রিকা, ১৭/০৫/২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ 'কনককটিং দ্য প্রাইমরডিয়াল স্যুপ'।)

তাঁর অসাধারণ গবেষণা কাজ, 'দ্য অরিজিন অফ লাইফ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইউএসএসআর একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর পূর্ণ সদস্য হন এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ইনস্টিটিউট অফ বায়োকেমিস্ট্রির ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওপারিন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মস্কোতে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে ১৬টি দেশের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সভা আয়োজন করেন, পরে ১৯৬৩ ও ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে অনুরূপ সভা করেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিরো অফ সোস্যালিস্ট অফ লেবার হিসাবে মনোনীত হন এবং পরের বছর ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য অরিজিন অফ লাইফ এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে লেনিন পুরস্কার এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে জৈব রসায়নে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য লোমোনোসভ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল মস্কোতে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ■

দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের যেতে হয় না। একজন মানুষ হিসেবে আমি একজন বায়োলজিস্ট এবং বিশ্বকে দেখি এক অনভ্যস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে, কিন্তু আমি মনে করি না তা সম্পূর্ণ ভুলপথে চালিত করে।

স্কুল জীবনে ল্যাটিন এবং গ্রিক ক্লাসিকগুলি পড়েছি, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং জীববিজ্ঞান পড়েছি আমার বাবার নির্দেশে ও পরিচালনায়, ... রসায়ন বিজ্ঞান পড়ানোর পদ্ধতি ছিল ভালো এবং ষোল বছর বয়সে সহযোগী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে যা বাবা গবেষণা করছিলেন, তার কয়েকটি আবিষ্কার করলাম। সি. জি. ডগলাসের সহকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তৈরি সাইন্টিফিক পেপারটি ছিল আমাদের যৌথ প্রয়াস, যা ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি স্বীকৃতি দিয়েছিল যখন আমি সতেরো বছরের।"

যখন তাঁর বয়স চার, একবার কপালে কেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়ায় যন্ত্রণায় কাতর না হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন – "এই রক্ত কি অক্সিহিমোগ্লোবিন, নাকি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন?" একটু বড় হয়ে বাবার সঙ্গে গেছিলেন সেখানকার খনি শ্রমিকদের শারীরিক অবস্থা জানতে। এই সময়কালে তিনি লগটেবিল ছাড়া দূরুহ গাণিতিক হিসাব করতে পারতেন। তাঁর বাবার গবেষণার প্রয়োজনে 'গিনিপিগ' হয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে এইচএমএস স্প্যাঙ্কার, রোথেসে পরীক্ষামূলক ডাইভিং স্যুট পরে আটলান্টিক মহাসাগরে ঝাঁপ দেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের শরীরে ডিকমপ্রেশন (উচ্চ চাপ থেকে মুক্তি)-এর প্রভাবগুলি অনুভব করেছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নিউ কলেজ, অক্সফোর্ডে গণিত নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেও জিনতত্ত্বের গবেষণায় মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে জিন সংযোগের উপর প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বাবার সঙ্গে সহ লেখক হলেন ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

বিজ্ঞান গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পাশে ইটন কলেজে সাহিত্য নিয়ে পড়ার জন্য পেলেন স্কলারশিপ। সেখান থেকে অক্সফোর্ডে চলে আসেন ক্লাসিক সাহিত্য নিয়ে ডিগ্রি কোর্সে পড়তে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক সাহিত্য নিয়ে ডিগ্রি লাভ করার পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তাঁকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সে সময় জার্মানরা সেনা ট্রেঞ্চে বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণ করতো। তিনিও এই আক্রমণের শিকার হন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাবা ফ্রান্সের গ্রামের একটি স্কুলে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাসে মানুষের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন। সেখানে মাস্ক পরে ও না পরে জে. বি. এস. হ্যালডেন স্বেচ্ছাসেবী হন। এরপর আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। অ্যামবার রিজের যুদ্ধে তিনি আহত হন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসেন এবং আবার আহত হন বোমার আঘাতে। এবার তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতে অসুস্থ অবস্থায় ১৬ মাস কাটান।

পড়াশুনোটা গবেষণার স্বার্থে করতে হবে। তাই প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে গবেষণার জগতে না এসে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও তার প্রয়োজনে জ্ঞান লাভটাই ছিল তাঁর বাবার উদ্দেশ্য। পরিবারের স্বচ্ছলতা ও গবেষণার পরিবেশ এটা সম্ভবপর করেছিল। বিশ্বযুদ্ধে যোগদান তাঁর প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষায় ডিগ্রি লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়েছিল ঠিকই, তবে তাঁর জীববিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পরিবারগতভাবে ও স্বশিক্ষা এমনই পর্যায়ের ছিল যে প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর নিউ কলেজ, অক্সফোর্ডে ফিজিওলজিতে একটি ফেলোশিপ পান এখানে তিনি ফিজিওলজি এবং জিনতত্ত্বে একত্রে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রফেসর এফ. জি. হপকিনস-এর অধীনে বায়োকেমিস্ট্রিতে রিডার হিসাবে নিযুক্ত হন। এখানে গবেষণা, বাওকেমিস্ট্রি পড়ানোর পাশাপাশি তিনি 'ম্যাথামেটিকাল থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক গবেষণাপত্রগুলি রচনার সময় পান। এগুলো বিজ্ঞানী ফিশার এবং রাইটের পাশাপাশি পপুলেশন জেনেটিক্সে তাঁর একক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই সময় তিনি ফিজিওলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রিতে অসাধারণ গবেষণাগুলি চালিয়ে যান। এর মধ্যে 'ল অফ স্টেডি স্টেট কাইনেটিক্স ইন এনজাইম কেমিস্ট্রি' উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণাটি তিনি জি. ই. ব্রিগস নামক বিজ্ঞানীর সঙ্গে যৌথভাবে করেছিলেন। এই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াগুলি তাপগতিবিদ্যার নিয়ম মেনেই হয়।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে জে. বি. এস. হ্যালডেন শার্লট ফ্রাঙ্কেন নামক এক সাংবাদিককে বিয়ে করেন। শার্লট ছিলেন একজন নারীবাদী।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে সস্ত্রীক ভ্রমণে যান। সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম গাছের বীজের ভান্ডারটি দেখেন এবং এর প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী নিকোলাই ভ্যাভিলভের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'দ্য বিগিনিং অফ এগ্রিকালচার'-এ এই প্রসঙ্গ জানা যায়। সেখানে আছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে সক্ষম শস্যের চারার সন্ধানে বিশ্বভ্রমণের বর্ণনা।

তিনি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নে গেলেও সেখানকার বিজ্ঞানী ওপারিন যে অজৈব পদার্থ থেকে কিভাবে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, সেই তত্ত্ব সম্পর্কে প্রকল্প বা হাইপোথিসিস ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দেই

উপস্থাপন করেছেন, সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এর কারণ ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ওপারিনের 'অরিজিন অফ লাইফ' ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। এমন সমস্যা তাঁর পরবর্তীকালেও হয়েছে, তা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় লাইসেঙ্কো প্রসঙ্গে আলোচনায়। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্রভাবে একই গবেষণা করেন, যা আজ ওপারিন-হ্যালডেন প্রকল্প বলে স্বীকৃত। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এই প্রকল্পকে পরীক্ষার দ্বারা দুই মার্কিন বিজ্ঞানী স্টানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরে ল্যাবরোটরিতে প্রমাণ করেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পপুলেশন জেনেটিক্সের উপর প্রথম জীবনের কাজগুলিকে একত্রিত করে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম 'দ্য কজেস অফ ইভল্যুশন' বা 'বিবর্তনের কারণগুলি।' তাঁর এই ম্যাথামেটিকাল থিওরি অফ ন্যাচারল সিলেকশন জেনেটিক্স ও বাওলজির ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য পাঠ্যপুস্তক।

জে. বি. এস. এবং শার্লট হ্যালডেন উভয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের পর থেকে ক্রমশ কম্যুনিস্ট মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শার্লট হ্যালডেন গ্রেট ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। তিনি স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের হয়ে তহবিল সংগ্রহের কাজ করেছেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যখন জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে সে দেশ আক্রমণ করলো, তখন শার্লট হ্যালডেন ব্রিটিশ যুদ্ধ সাংবাদিক হয়ে সেখানে যান। এসময় তিনি 'ডেইলি স্কেচ'-এর হয়ে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হন। তিনি এই সময়কালে তাঁর রাশিয়ান নিউজরিলে ('অ্যান আই-উইটনেস অ্যাকাউন্ট অফ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যাট ওয়ার') রুশী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেন। কিন্তু সেখানকার যৌথখামারকে তিনি নেতিবাচক চোখে তুলে ধরেন। এরপর ইংলন্ডে ফিরে এসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এর কারণ অজানা।

জে. বি. এস. হ্যালডেনের একজন উদারতাবাদী থেকে মার্কসবাদী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে, বিশেষ করে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আগ্রহ তাঁকে মার্কসবাদের দিকে আকর্ষিত করেছিল। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কে নির্বিচার আগ্রহ এবং তাদের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক খোঁজার দৃষ্টিকোণ (যাকে তিনি এক অনভ্যস্ত দৃষ্টিকোণ বলেছিলেন) মার্কসবাদী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রকে সহজ করেছিল। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মার্কসবাদ সম্পর্কে ধারাবাহিক কতগুলি লেকচার দেন। সমকালীন বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা এবং গণিত সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে যে মননশীল বিশ্লেষণ রাখেন, তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিজ্ঞানের তৎকালীন সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি শাখায় অবাধ চলাচলের কারণে এবং গভীর বিজ্ঞান শিক্ষার কারণে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন গুণ বিরল। **মার্কসবাদ তাঁর বিশ্লেষণে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (method)**। এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে তিনি একজন বিজ্ঞানী হিসেবে দেখিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত সবথেকে কম সংশোধন করে নিয়ে এই একটিই দর্শন বিজ্ঞানের সকল শাখাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। তিনি মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যে লেকচারগুলি দিয়েছিলেন, তা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য মার্কসিস্ট ফিলোজফি অ্যান্ড দ্য সায়েন্স' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে পার্টটাইম প্রফেসর অফ জেনেটিক্স হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে হন প্রফেসর অফ বায়োকেমিস্ট্রি। এর একবছর আগে এক্স-ক্রোমোজোমের একটা ম্যাপ প্রস্তুত করেন, যেখান থেকে জিনঘটিত বর্ণান্ধতা সম্পর্কে, একপ্রকার বিশেষ চর্মরোগ সম্পর্কে এবং দু'ধরনের অস্বাভাবিক চোখের অসুখ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চা-গবেষণা একদিকে যেমন চলছিল, অন্যদিকে চলছিল মার্কসাবদী হয়ে ওঠার জন্য অধ্যয়ন। মার্কসবাদী পদ্ধতি অনুসারে প্রকৃতি বিজ্ঞানকে দেখার প্রক্রিয়া তাঁকে মার্কসবাদী করে তুলেছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচিত অসমাপ্ত পুস্তক 'ডায়ালেকটিস্ অফ নেচার' এর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা (preface) এবং টীকা (notes) লেখেন। ১৯৩৮-এ রচিত বইটিতে (যা আসলে কতগুলি বক্তৃতার সংকলন) লেখেন "আমি কেবলমাত্র খুব সংক্ষিপ্তভাবে শেষ অধ্যায়ে মার্কসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব এবং যেহেতু আমি অর্থনীতিবিদ নই, আমি মনে করি না যে আমার আলোচনা অভিনব বা প্রামাণিক হবে।" এই বইটি পড়লে বোঝা যায় যে এতদিনকার বিজ্ঞান শিক্ষাকে তিনি কিভাবে মার্কসবাদী পদ্ধতি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ছোটবেলা থেকেই প্রয়োগের উপর জোর দিয়ে, তার প্রয়োজনে ও তার থেকে শিক্ষালাভের পদ্ধতিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মার্কসীয় বস্তুবাদও প্রয়োগকেই প্রাধান্য দেয়। তত্ত্বের আগে প্রয়োগের স্থান। প্রয়োগই নির্ভুলতর ধারণার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। এই কারণে তিনি মার্কসবাদকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ বাবার লেখা থেকেও পেয়েছেন। তাঁর বাবা জন স্কট হ্যালডেন লিখেছিলেন "ভৌত-রাসায়নিক বাস্তবতা অথবা আমাদের চারপাশের বিশ্বকে মামুলি পদার্থবিজ্ঞানগুলিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা বাস্তবের অনুরূপ। এই ধারণা কেবলমাত্র জীবন সম্পর্কে নয় সচেতন আচরণের সম্পর্কেও প্রযোজ্য – এই মতবাদকেই বলা যেতে পারে বস্তুবাদ।"

'দ্য মার্কসিস্ট ফিলোজফি অ্যান্ড দ্য সায়েন্স' বইতে জে. বি. এস. হ্যালডেন তাঁর বাবার এই বক্তব্যের পরই লেখেন – "লেনিন

যা লিখেছেন তার সঙ্গে যদি আমরা এটা মিলিয়ে দেখি তা হলে আমরা দেখব যে জে. এস. হ্যালডেনের মত, অন্তত উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, মার্কসবাদের বিরোধী নয়। লেনিনের কথায় ঃ

"এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে বস্তুবাদ চেতনাকে – যা হলো লঘুতর বাস্তবতা – স্বীকার করে নেবে অথবা তড়িৎ-চৌম্বক অথবা আরও অপরিমেয়ভাবে জটিল কোনো গতি সম্পন্ন বস্তুর ধারণা না করে যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণাকে স্বীকার করে নেবে।"

মার্কসীয় বস্তুবাদের মূল ভিত্তি হল বস্তুকে চেতনার উর্দ্ধে দেখা। যা কিছু আমাদের ধারণা, বোধ বা অনুভূতি, সবই বস্তুজগত থেকে আসে। এই দর্শন তিনি পারিবারিক সূত্রেও পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ডারউইনবাদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে, জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে, অজৈব জগৎ থেকে জীবজগতের আগমন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবিধ বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে, সর্বোপরি মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর রচনা অধ্যয়ন করে তিনি মার্কসবাদী হয়ে ওঠেন। এর পাশাপাশি পারিবারিক পরিবেশও ছিল এই আদর্শের পক্ষে। কিন্তু জে. বি. এস. হ্যালডেনের মার্কসবাদের জ্ঞান ছিল মৌলিক। তাই ঘটনাকে নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করার অভ্যাস থাকায় এই বিশ্বাস থেকে তাঁকে সহজে বিচলিত করা যায় নি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রমজীবীদের দৈনিক পত্রিকা 'ডেইলি ওয়ার্কার্স' এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। সারা দিনের খাটুনির পর ট্রেড ইউনিয়নে শ্রেণীসংগ্রাম করতে করতে শ্রমজীবীরা কি পড়বেন? কেন পড়বেন? তাঁদেরকে কোন্ কোন্ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন? – এসব ছিল ডেইলি ওয়ার্কার্সে গবেষণার বিষয়। এই কাজে তিনি যে নমুনাগুলি রেখে গেছেন তা আজকে আমরা যারা শ্রমজীবীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচার-প্রসার চাইছি, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার থেকে তাদের মুক্ত করতে চাইছি, তাদের জন্য এগুলি শিক্ষণীয় নিবন্ধ। দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। তবেই শুধু কুসংস্কার মুক্ত হওয়া যাবে না, এই পুঁজিবাদ যে চিরকাল ছিল না, তাই বস্তু বিকাশের নিয়মে আগামীতেও একইভাবে টিকবে না – এই শিক্ষাটাও আসলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে সর্বদা স্বাগত জানাতে তাঁর 'অ্যাটম-স্ম্যাশিং' নামক নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি লিখেছিলেন যে কৃত্রিমভাবে পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তাকে সমাজে স্টিম ইঞ্জিনের মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারাবাহিক বিকাশের সাথে সাথে মানব সমাজের বিকাশকে দেখার মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ তাঁর সর্বদা কার্যকর ছিল।

জে. বি. এস. হ্যালডেন ও তাঁর স্ত্রী শার্লট হ্যালডেন এর মতাদর্শগত বিভিন্নতা একসময় বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

নিজের বিজ্ঞান গবেষণা প্রসঙ্গে যদিও লিখেছেন – "আমার বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড বিভিন্ন রকম। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ইথার লবণের বিক্রিয়া প্রসঙ্গে হিউম্যান ফিজিওলজিতে আমি সর্বাগ্রে পরিচিত। ... জেনেটিক্সে আমি প্রথম স্তন্যপায়ীদের লিংকেজের আবিষ্কর্তা ছিলাম। মানুষের ক্রোমোজোমের ম্যাপ তৈরি করতে এবং পেনরোজের সঙ্গে মানব জিনের মিউটেশনের হার নির্ণয় করতে আমার আবিষ্কার ছিল প্রথম। আমি গণিতেও কিছু ছোটখাটো আবিষ্কার করেছি।" তবুও হ্যালডেন নিজেকে বায়োলজিস্ট হিসেবেই পরিচয় দিতেন। বায়োলজি বা জীববিজ্ঞানে তাঁর ডারউইনবাদের বিকাশে অবদান অনন্য। পুঁজিপতিশ্রেণীর প্ররোচনায় ডারউইনবাদের বিপক্ষে প্রচার যেমন ছিল, তেমনি চলছিল এই মতবাদের বিকৃতি সাধন। এটা তারা করতে পেরেছিল এই জন্যই যে ডারউইনবাদ ছিল সদ্য আবিষ্কৃত একটি বিকাশমান মতবাদ। তিনি 'ডারউইনবাদ কি মৃত?' নিবন্ধে লিখেছেন "আমরা প্রায়ই শুনি যে ডারউইনবাদ হল উনিশ শতকের অন্যতম কাল্পনিক তত্ত্ব। কিছু মানুষ বলে বিবর্তন হল মিথ্যা, ... এখন যে কেউ ডারউইনের কাজের ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারে। তিনি ত্রুটিমুক্তি ছিলেন না। একইভাবে বলা যায় নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না, কিন্তু এটা এখনো যে উদ্দেশ্যে রূপ নিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ভালো কাজ করে। ডালটনের পরমাণুবাদকে তো সংশোধন দরকার, কিন্তু এখনো এটা রসায়ন বিজ্ঞানের ভিত্তি। এবং যদিও মার্কসের বেশ কিছু পূর্বানুমান সঠিক ভাবে মেলেনি, তবুও তিনি অতুলনীয়ভাবে ভবিষ্যতের সমাজের পরিবর্তনের অপেক্ষাকৃত ভালো ভ্যাখ্যা দিয়েছেন সমসাময়িকদের তুলনায়।" ডারউইনবাদকে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিরকাল দেখেছেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে লিখেছিলেন – **"মার্কস এবং এঙ্গেলস্ এই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম নামক তত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন 'আবিষ্কৃত ঘটনার একটি প্রথম, অস্থায়ী, অসম্পূর্ণ প্রকাশরূপে।'** ... কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্রকৃতিতে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে অস্বীকার করেন নি। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো ভূমিকা নেবে, ক্রোপোটকিন (kropotkin) প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার সহযোগিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, এটা হয় কিন্তু এটা ব্যতিক্রম।

বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হল একটি তত্ত্বকে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাও এবং দেখাও এটি নিজেরই নেতি ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা জানি অতি পরিচিত রাসায়নিক মৌলের পরমাণু আসলে অবিভাজ্য নয়। কিন্তু এটা আবিষ্কার হতো না যদি না

রসায়নবিদরা পরমাণুর অবিভাজ্য অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখতো এবং এর ধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান চালু না রাখতো, ডালটনের পরমাণুবাদ এখনও রসায়ন বিজ্ঞানের ভিত্তি, কিন্তু এটা এমনই ভালো তত্ত্ব যে কিনা নিজেকেই ভুল প্রমাণিত করে এবং পরম সত্যের অভিমুখে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করে।"

ডারউইনবাদকে এই মার্কসবাদী পদ্ধতিতে বিচার করার কারণে ভবিষ্যতে জীববিজ্ঞানের জগতে যে মতবিরোধগুলির তিনি সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর যে অংশ ডারউইনবাদকে অসত্য বলে প্রচার করে তাদের জীবাশ্মবিজ্ঞানে, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে এবং সে ক্ষেত্রে ডারউইনবাদকে ব্যবহার করার দ্বিচারিতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার ডারউইনবাদের বিকৃতির সমালোচনা করে লিখেছেন – "ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব যোগ্যতমের উদ্বর্তনকে আবার ব্যবহার করা হয় মানুষের অবিচারের (injustice) এর সমর্থনে। বাস্তব যদিও এই প্রচেষ্টার বিপরীত।"

তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদকে আরো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। ডারউইন উত্তর তাঁর সময়কার গবেষকদের (যেমন সেসময়কার বনমানুষের অন্তত ছয় প্রকার কঙ্কাল আবিষ্কারের মতো অন্যান্য মিসিং লিঙ্কগুলির আবিষ্কার, সোভিয়েত বায়োলজিস্ট গস-এর গবেষণা, অক্সফোর্ডের বায়োলজিস্ট এলটনের গবেষণা) গবেষণা প্রসঙ্গে লিখেছেন, যেগুলো ডারউইনের মতবাদের সমর্থনে যেমন তথ্য জুগিয়েছে, তেমনি তার মধ্যকার অসম্পূর্ণতাকে অনেকভাবে পূরণ করেছে।

একই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সোভিয়েত জীববিজ্ঞান গবেষণা প্রসঙ্গেও দেখা যায়। তাঁর লেখা 'এ গ্রেট সোভিয়েত বায়োলজিস্ট' নামক প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে জীববিজ্ঞান বিষয়ে তৎকালীন বিজ্ঞানীদের মধ্যকার মতবিরোধ ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বারা প্রচারিত মিথ্যাচারের বিপরীতের হ্যালডেনের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি লাইসেঙ্কোকে একজন ভালো কৃষি প্রযুক্তিবিদ বা প্রকৌশলী হিসেবে দেখিয়েছেন। সে সময় লাইসেঙ্কো ভার্নালাইজেশন (ল্যাটিন ভাষায় ভার এর অর্থ বসন্ত) নামক ফসলের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের একটি প্রকৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। হ্যালডেন লিখেছেন যে এই পদ্ধতি ক্ষুদ্র চাষীর জন্য অনুপযোগী হলেও যৌথ খামারে খুব সহজে করা সম্ভব। হ্যালডেন লিখেছেন – "লাইসেঙ্কো গাছের ব্রিডিং নিয়ে কাজ করছেন। এ বিষয়ে তাঁর পূর্বতনদের সঙ্গে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে ইংরাজীতে সম্পূর্ণ রিপোর্ট নেই। কিন্তু আমি আশা করছি এডিনবার্গে আগামী অগাস্টে যে আন্তর্জাতিক জেনেটিক্স কংগ্রেস হবে সেখানে তিনি উপস্থিত থেকে তাঁর কাজকে ব্যাখ্যা করবেন।" কিন্তু এই বিজ্ঞান সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কেউ আসেন নি। হ্যালডেন 'হেরেডিটি' বা 'বংশগতি' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে একদিকে নাৎসী জার্মানি ডারউইনবাদকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে প্রচার করে যে কোনো জাতির শ্রেষ্ঠত্ব থাকে তার জিনে। তাই এই জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ যদি অন্যদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যায় তবে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারায়। যদি নিম্নতর জাতিগুলিকে সামগ্রিকভাবে নির্বীজকরণ করা যায় তবেই আগামী মানব প্রজাতি শ্রেষ্ঠদের সকল বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে। অন্যদিকে লাইসেঙ্কোর পদ্ধতিতে গাছের ব্রিডিং দেখে কিছু গাছের ব্রিডার মনে করেন (সোভিয়েত ইউনিয়নের) যে যদি বীজকে পরিবর্তিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন লাইসেঙ্কোর ভার্নালাইজেশন দ্বারা করা যায়, তবে এই অভ্যাস বংশগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হবে।

হ্যালডেন নাৎসীদের তত্ত্বকে যেমন ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত তত্ত্ব বলেছেন, তেমনি মনে করেছেন ভার্নালাইজেশন প্রকৌশল হিসেবে ভালো হলেও এই প্রসঙ্গে কর্মরত কিছু বায়োলজিস্টের মতামতও বিজ্ঞান সম্মত নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে সারা বিশ্বে বায়োলজিস্ট মহলে লাইসেঙ্কোকে 'ছদ্ম বিজ্ঞানী', তাঁর তত্ত্ব অসত্য বলে প্রচার করা হয়। এর সঙ্গে প্রচার করা হয় যে যেহেতু লাইসেঙ্কোকে স্তালিন সমর্থন করতেন এবং লাইসেঙ্কোর সঙ্গে নিকোলাই ভ্যাভিলভের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মত বিরোধ ছিল, তাই লাইসেঙ্কো তার প্রভাব খাটিয়ে ভ্যাভিলভকে গ্রেফতার করান এবং গুলাগে তাঁকে হত্যা করান।

এমন অবস্থায় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সেন্টার ১৯৪৮ এর ৩০শে ডিসেম্বর তিনজন ব্রিটিশ বায়োলজিস্টের সাক্ষাৎকার নেয়। সেখানে তিনি বলেন ঃ "জনসাধারণকে বলা হয়েছে যে বিখ্যাত রাশিয়ান প্লান্ট ব্রিডার ভ্যাভিলভ জেলখানায় মারা গেছেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রিসার্চ স্টেশন লেনিনগ্রাদের বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু 'জার্নাল অফ হেরিডিটি'-র একটি খুব লাইসেঙ্কো বিরোধী প্রবন্ধে লিখেছে যে উত্তর মেরু সংলগ্ন অঞ্চল 'মাগাদান'-এ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রস্ট রেজিস্ট্যান্ট গাছের চারার ব্রিডিং নিয়ে গবেষণাকালে তিনি মারা যান।' (সূত্র ডি.বি. পলের নিবন্ধ 'এ ওয়ার অন টুক ফ্রন্ট') এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা স্তালিন বিরোধী প্রপাগান্ডার তিনি অংশীদার হতে রাজি হন নি।

বৈজ্ঞানিক গবেষকদের প্রসঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী প্রচার মাধ্যমের মিথ্যাচারকে তিনি যেমন এভাবে প্রতিহত করেছিলেন, তেমনি নাৎসী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের গবেষকদের তার বিরোধী তত্ত্ব (যাকে লাইসেঙ্কোর তত্ত্ব বলে প্রচার করা হয়)-কেও তিনি

সঠিক মনে করেন নি। লাইসেঙ্কো যখন জেনেটিক্স-এর অতিরঞ্জনকে বিরোধিতা করেন, তখন হ্যালডেনও তাতে সমর্থন জানান, আবার সাথে সাথে লেখেন – "জেনেটিক্স এর অর্থনৈতিক মূল্য অনেক বেশি যতটা তিনি (লাইসেঙ্কো) মনে করেন, তার থেকেও।"

ডেইলি ওয়াকার্সের সম্পাদনা তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করেছেন। হ্যালডেনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে রামচন্দ্র গুহ লিখেছেন যে হ্যালডেন এই দায়িত্বে থেকেছেন ততদিন, যতদিন তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। যদিও পার্টির সদস্যতা ত্যাগ করার বিষয়ে কোনো অফিসিয়াল পদক্ষেপ রাখেন নি। এখান থেকে তাঁর মার্কসবাদী দর্শন পরিত্যাগ বিষয় একটা প্রচার শোনা যায়। বাস্তব অবস্থাটা এতটা সরল নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কম্যুনিস্ট পার্টির তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠনকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তার ভূমিকারও পরিবর্তন দেখা যায়। এছাড়া ১৯৫০-এর পর থেকে ইউএসএসআর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ (cold war) শুরু হয়ে যায়। এই সময় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদী অর্থাৎ পুঁজিবাদী চরিত্র লাভ করে। কেন এমন হয়, তা আলাদাভাবে চর্চার বিষয়। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই ছিল। এমন পরিস্থিতিতে হ্যালডেন ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে নিরবে সরে এসে বিজ্ঞান চর্চায়, বিশেষ করে ডারউইনবাদের বিকাশের জন্য গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে আগমনের (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে) কিছুকাল আগে এক মার্কিন সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁর মতে ভবিষ্যৎ হল অন্ধকার মৃত্যু। তার আগে তিনি অত্যন্ত দশ বছর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ ও পড়ানোর জন্য ভারতে যেতে চান। তাঁর মতে ইউএসএসআর এবং ইউএসএ পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং চীন ও ইউরোপের ক্ষেত্রেও তাই হবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর ধারণা ছিল ভারতে সম্ভবত জীববিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকবে।

হ্যালডেন ভারতে স্থায়ীভাবে আগমনের আগে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে দু'বার এসেছিলেন। রাজনৈতিক ও কর্মজীবনে এই পর্যায়ে এমন অনেক পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কিছু পরিবর্তন হয়। তিনি হেলেন স্পুরওয়েকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে করেন যিনি আমৃত্যু তাঁর জীবন সঙ্গী থেকেছেন। বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ঠান্ডা যুদ্ধ পর্যায়ে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এইসময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারত ছিল মুক্ত দেশ। লন্ডন ছাড়ার আগে প্রেসকে বলেছিলেন – 'আমি এমন একটি মুক্ত দেশে বাস করতে চাই, যেখানে কোনো বিদেশী আগ্রাসন নেই।' তিনি কেন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম মুহূর্তে পূর্বতন স্বাধীন করদ রাজ্যগুলিতে সেনা পাঠিয়ে দখলের ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করেন নি, জানা নেই। তিনি কেন সে সময়কার ভারত-পাক যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধমুক্ত দেশ হিসাবে ভারতকে দেখেছিলেন, তার কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু এই সময় থেকে কয়েকটি বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

তিনি ভেবেছিলেন ভারত একটি যুদ্ধহীন শান্ত ও মুক্ত দেশ। যেখানে আধুনিক ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ, সাইক্লোট্রোন না পাওয়া গেলেও পাওয়া যাবে ডারউইন এবং বেটস্‌ন যেমন পরীক্ষাগার পছন্দ করতেন তেমন পরিবেশ।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতের স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউট থেকে তাঁর ও তার স্ত্রীর জন্য কাজের প্রস্তাব আসে। তিনি সে সময় ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন থেকে অবসরের খুব কাছাকাছি ছিলেন। এমন অবস্থায় এই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করে কলকাতায় বরানগরে চলে আসেন। এখানে তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা করেন। এ বছর তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পান।

ভারতে আগমনের পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কী পাল্টে গেছিল? এটা বুঝতে আমাদের ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা রচনা 'অ্যান ইন্ডিয়ান পারস্পেকটিভ অফ ডারউইন' পড়া দরকার।

এই নিবন্ধের শুরুতে লিখেছেন –

'মানব সংস্কৃতির জন্য ডারউইনের তাৎপর্যকে মূল্যায়ন করাটা খুব আগবাড়িয়ে করা ব্যাখ্যা বলে মনে হবে, তবে এটা সহজ হয়ে যায় যদি কারোর stereoscopic view (বহুমাত্রিক দৃষ্টি) থাকে যা দিয়ে আমাদের পৃথিবীর একাধিক সংস্কৃতিকে ঘনিষ্টভাবে পরিমাপ করা হয়। আমি ভারতীয় না হয়ে ওঠার আগে এই নিবন্ধটি লিখতে পারতাম না। ইউরোপীয়দের এবং আমেরিকানদের কাছে এটা মনে হয় যে ডারউইনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হল সেখানকার শিক্ষিত নারী-পুরুষ মনে করে জীবের বিবর্তন হল বাস্তব ঘটনা, জীবিত গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা সবাই এসেছে এমন প্রজাতি থেকে যাদের সঙ্গে তাদের উভয়ের কোনো সাদৃশ্য নেই এবং নির্দিষ্টভাবে মানুষ এসেছে পশুদের থেকে। এটা ছিল ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ খ্রিষ্টান থিওলজিয়ানরা মানুষ এবং অন্য জীবের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ রেখা টেনে থাকেন। ....

তিনি এই রচনায় বলেন, "আমার মতে, ডারউইনের সবচেয়ে আসল অবদান জীববিদ্যার বিবর্তনবাদ নয় বরং তাঁর একরাশি পরীক্ষামূলক বটানির বইগুলি যা তাঁর জীবনের শেষাংশে প্রকাশিত হয়। সেগুলো গাছপালার জীবনের সেই বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত, যেগুলো প্রাণীর এবং মানুষের মতো। দুটি বই ছিল যথাক্রমে গাছের বেড়ে ওঠা নিয়ে এবং কীটনাশক উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয়ের। তিনটি বই ছিল গাছের যৌনতা (sexuality in plants)-এর বিষয়ে, নির্দিষ্ট করে সেই দিকগুলি যেগুলো অনেকটাই মানুষের মত (which

are most human), ... এই ঘটনাগুলি তিনি আবিষ্কার করেছেন হঠাৎ করে। এগুলোর প্রয়োগে গাছের হরমোনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে"।...

তিনি এই রচনায় কোথাও অতিপ্রাকৃতের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেননি। বরং তার বিপরীতে হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু ডারউইন যেমন জীবকূলের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অচ্ছেদ্য সম্পর্কটাই খুঁজেছেন, তেমনি এদেশে এবং চীনের বিদ্যমান দার্শনিক চিন্তায়, মহাকাব্যে, লোককথায় এই সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয় নি। এটা তিনি ভারতে এসে মানসিকভাবে ভারতীয় হয়ে উঠে উপলব্ধি করেছিলেন। হ্যালডেনের ভারতে আগমনের পর অনেক লেখকই দেখাতে চেয়েছেন যে তিনি বস্তুবাদ ত্যাগ করে ভাববাদী, হিন্দুত্বের দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে গেছিলেন। তিনি নাকি নিরামিশ আহার করতেন ইত্যাদি। খাওয়া-পড়া সবই মানুষের নিজস্ব পছন্দের বিষয় এবং এর পিছনে আরো অনেক কারণ থাকতে পারে। এগুলো তাঁর দার্শনিক চিন্তার নিয়ামক হতে পারে না। তাই হ্যালডেনের দার্শনিক চিন্তা ভারত আগমনের পর কেমন ছিল তা বুঝতে সরাসরি তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায়।

ভারতীয় সন্ত-ঋষিদের সম্পর্কে যে দয়ালু-জীবকূলের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কে আগ্রহী – এককথায় প্রকৃতি প্রেমের ধারণা করা হয় ডারউইনের মধ্যেও তিনি তা খুঁজে পেয়েছিলেন। এর অর্থ দাঁড়ায় না যে এখানকার ভাববাদী দর্শনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। এই ভুল ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই সরাসরি হ্যালডেনের লেখা পাঠ করেই এগোনো দরকার।

বৈজ্ঞানিক যে গবেষণার জন্য হ্যালডেন এদেশে এসেছিলেন শেষ জীবনে সে প্রসঙ্গে তাঁরই এখানকার ছাত্র গবেষক কৃষ্ণ দ্রোনামরাজু লিখেছেন – [জে. বি. এস. হ্যালডেন'স লাস্ট ইয়ারস ঃ হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া (১৯৫৭-১৯৬৪)] – 'আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল (হ্যালডেনের ভারতে গবেষণার জন্য আগমন প্রসঙ্গে বলছেন– সমীক্ষণ)

এদেশের গাছপালা এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর উপর গবেষণা করা এবং মানব জনসংখ্যার উপর গবেষণা করা। এমনকি ১৯১৭-তে যখন তাঁকে মেসোপটেমিয়া (ইরাক) থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ভারতে চিকিৎসার জন্য পাঠায়, তখন থেকেই তাঁর এই আগ্রহ ছিল। তিনি অনেকবার এইখানে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৭-তে তাঁর আগমনের পর তিনি অনেকগুলো ইকোলজিকাল ও বায়োমেট্রিকাল গবেষণা শুরু করেন।' এছাড়া ১৯২০-র পর্যায়ে যে পপুলেশন জেনেটিক্স নিয়ে তত্ত্বগত কাজ শুরু করেছিলেন তার জন্য এদেশকে বেছেছিলেন তথ্য সংগ্রহের জন্য।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউট, কলকাতায় গবেষনা করেন। সেখানে তাঁর চার সহযোগী ছিলেন এস. কে. রায়, টি. এ. ডেভিস, এস. ডি. জয়কর এবং কৃষ্ণদ্রোনমরাজু। কৃষ্ণদ্রোনমরাজু লিখেছেন যে এখানকার ডিরেক্টর পি. সি. মহালনবিশের সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য তিনি এই গবেষণা সংস্থা থেকে পদত্যাগ করেন এবং উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজুপট্টনায়কের আহ্বানে ভুবনেশ্বর চলে যান গবেষণার জন্য।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর রেকটাল ব্লিডিং হচ্ছিল। তিনি ফেরার পথে লন্ডনে চিকিৎসা করতে গিয়ে জানতে পারেন যে তাঁর অন্ত্রে ক্যানসার ধরা পড়েছে। এসময় তিনি ক্যানসার নিয়ে একটি কবিতাও লিখে ফেলেন, যার নাম 'ক্যানসার ইজ এ ফানি থিঙ্গ' অর্থাৎ 'ক্যানসার একটি মজার জিনিস'। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অস্ত্রপচার হয় এবং তিনি এরপর ভুবনেশ্বরে ফিরে আসেন। এরপর থেকে কিছুদিন সুস্থ থাকার পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় আসেন আবার চিকিৎসার জন্য। তারপর আবার ফিরে যান উড়িষ্যায়। পয়লা ডিসেম্বর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর মরদেহ নিকটবর্তী মেডিকেল কলেজকে দান করা হয়। **মরণত্তোর দেহদান করে তিনি যে ভাববাদী বিশ্বাসী ছিলেন না, তার প্রমাণ রেখে যান।**

বিজ্ঞানী হিসেবে, বিশেষ করে জীব বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। এছাড়া সেই গবেষণা ভাববাদকে খন্ডন করে বস্তুবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কর্মকান্ড তিনি আজীবন চালিয়েছেন। তিনি মার্কসবাদকে বস্তুর বিকাশের বিজ্ঞানে প্রয়োগের যে বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন তার তুলনা হয় না। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানের বিষয়ে (যেমন সোভিয়েত বায়োলজি প্রসঙ্গে) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বস্তুবাদী। কিন্তু তাঁর এই গুণকে বিকশিত করতে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে কিছু বিষয়ে তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণার অভাব দেখা গেছিল। ব্যক্তি হিসেবে তিনি সেসময় দেশ-সমাজ সম্পর্কে কিছু মূল্যায়নে ভুল করেন, (যেমন চীন প্রসঙ্গে)। এককথায় বিশ্বে এবং ব্রিটেনের কম্যুনিস্ট পার্টির ভগ্নদশাকালে এমন বিরল প্রতিভা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সবশেষে তাঁর বিবর্তনবাদ সম্পর্কে শেষ মূল্যায়ন দিয়ে এই লেখা শেষ করা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন, ... 'আমি বিবর্তনবাদকে মোটামুটি ভালোভাবে বিগত চল্লিশ বছর ধরে অধ্যয়ন করছি এবং মেনে নিই যে জেনেটিক্স-এ যে সমস্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায় তা এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব ভবিষ্যতে অনেক অপ্রত্যাশিত ফল পেতে সাহায্য করবে।" হ্যালডেনের এই অনুমান যে কতটা সত্যি তা বর্তমানে জীববিজ্ঞান গবেষণাগুলি তুলে ধরছে। ■

মহাবিশ্বের বিস্ময় ঃ

কোয়েসার্স আসলে ব্ল্যাকহোল

পল মার্ডিন খুঁজে পেলেন সিগনেস এক্স-ওয়ান (Cygnus X-1) ব্ল্যাকহোল; মানুষের ডিটেক্ট করা প্রথম ব্ল্যাকহোল।

সিগনেস এক্স-ওয়ান-এর একটি চমকপ্রদ বিষয় হল – এটি বাইনারি স্টারের দৃশ্যমান স্টারটিকে ক্রমাগত গ্রাস করে নিচ্ছে। একসময় সম্পূর্ণ স্টারটিকেই গ্রাস করে নেবে। আর একটি বিষয় – এর শক্তিশালী জেট্স; এটি ব্ল্যাকহোলের অ্যাক্রেশন ডিস্কের লম্ব বরাবর অবস্থান করে। এর মাধ্যমে পার্টিকেল ও রেডিয়েশন আলোর কাছাকাছি বেগে ব্ল্যাকহোল থেকে দূরে ছিটকে যাচ্ছে।

এবার দেখা যাক, সিগনেস এক্স-ওয়ান-এর পর বিজ্ঞানীরা আর কী কী ব্ল্যাকহোলের খোঁজ পেলেন।

সিগনেস এক্স-ওয়ান ব্ল্যাকহোল ডিটেক্ট করা হয় হাই ফ্রিকোয়েন্সি এক্স-রে টেলিস্কোপের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে লো-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা ডিপ স্পেস দেখতে শুরু করলেন। সময়টা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। রেডিও সিগনালে ধরা পড়ল ডিপ স্পেসে কিছু রহস্যময় হটস্পট। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন কোয়েসি স্টেলার রেডিও সোর্সেস (QUASi - stellAR radio sources)। সংক্ষেপে কোয়েসার্স (QUASARS)।

এইসব হট স্পট থেকে আসা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম পরীক্ষা করে দেখা গেল – এরা বিশাল পরিমানে লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সিতে সিফ্‌ট হয়ে যাচ্ছে (red-shift)। এটা নির্দেশ করে – কোয়েসার্সগুলি উচ্চ গতিতে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ এদের এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন?

কুড়ি কোটি আলোকবর্ষ দূরে থেকে এরা প্রায় এক লক্ষ কোটি সূর্যের সমান শক্তি প্রতি সেকেন্ডে নির্গত করছে! বিজ্ঞানীরা অবাক। কোনভাবেই এই বিপুল শক্তির সমীকরণ মেলাতে পারছিলেন না। নিউক্লিয়ার এনার্জিও কি এত বিপুল শক্তির জোগান দিতে পারে? তাহলে কোথা থেকে আসছে এত শক্তি?

উত্তর হতে পারে – গ্রাভিটি বা মহাকর্ষ।

দৈনন্দিন জীবনে গ্রাভিটিকে আমরা খুব দুর্বল শক্তি হিসেবেই অনুভব করি। কিন্তু যদি বিশাল ভরকে অতি ক্ষুদ্র স্থানে (infinitely small point) একীভূত করা যায়, তবে সেখানে গ্রাভিটি হবে অকল্পনীয়। বিজ্ঞানীরা এবার সিদ্ধান্তে আসেন – এইসব হট স্পট আসলে এক একটি বিশাল ব্ল্যাকহোল। এদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে এত বিশাল উজ্জ্বলতা তৈরি হচ্ছে।

কোয়েসার্সের কেন্দ্রে থাকা এই সকল ব্ল্যাকহোল, এক একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল; সূর্যের ভরের লক্ষ থেকে কোটিগুণ।

কিন্তু এদের এক্স-রে টেলিস্কোপে ডিটেক্ট করা সম্ভব হচ্ছিল না কেন? অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে তো এক্স-রে-র মত হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশন নির্গত হয়। কারণ এটাই যে, এরা ক্রমাগত দ্রুত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে; লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ পেড়িয়ে পৃথিবীতে আসতে আসতে হাই ফ্রিকোয়েন্সি এক্স-রে, লো-ফ্রিকোয়েন্সিতে (যেমন রেডিও ওয়েভে) পরিণত হয়ে যায়। তাই এই সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলগুলি বিজ্ঞানীদের কাছে এক্স-রে টেলিস্কোপ নয়, রেডিও টেলিস্কোপে ধরা দিয়েছে।

এই সকল সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলগুলি মূলত এক একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাহলে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যাল্যাক্সির কেন্দ্রেও কি একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল রয়েছে?

একে খুঁজে পেতে বিজ্ঞানীদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কারণ, পৃথিবী থেকে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২৭ হাজার আলোক বর্ষ। এই মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে লক্ষ লক্ষ স্টার, হাস্ট, গ্যাস প্রভৃতি; উপরন্তু পৃথিবীর বায়ুমন্ডল। এদের বাধা অতিক্রম করে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের স্পস্ট ছবি (সার্প ইমেজ) ক্যাপচার করা খুব কঠিন কাজ – প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু কঠিন কাজ বলে তো বিজ্ঞানীরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। দুর্গমকে সুগম করা, আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে – কাল তাকে সম্ভব করা, আর তার জন্য নিরলস প্রচেষ্টার কর্মময় পথ হেঁটেই বিজ্ঞান যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে। আর বিজয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিশ্ববাসীকে। ■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ

হাওড়া জেলার মন্দিরে দেবতার আলতা মাখানো পায়ের ছাপ

গত ২০শে অক্টোবর ২০২৩, ভোরবেলা, হাওড়া জেলার হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পেঁড়ো থানার অন্তর্গত পেঁড়ো (পান্ডুয়া) গ্রামের একটি পুরাতন দুর্গা মন্দিরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে বলে সাড়া পরে যায়। খবরটা ফেসবুকেও ভাইরাল হয়ে যায়। এই গ্রাম কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান বলে খ্যাত। মন্দিরটি আনুমানিক ৩০০ থেকে ৩৫০ বছরের পুরানো। এবার আসা যাক যে অলৌকিক ঘটনা নিয়ে এত হইচই সেই প্রসঙ্গে। এই মন্দিরের অদূরে আছে একটি পুকুর। ঐ দিন ভোরে স্থানীয় মানুষ একটি লাল পেড়ে শাড়ী আবিষ্কার করেন পুকুর পাড়ে। তাঁরপর পুকুরঘাট থেকে মন্দিরের ভিতর পর্যন্ত আলাতা লাগানো পায়ের ছাপ পর পর অনেকগুলো পাওয়া গেছিল। শোনা যায় মন্দির যিনি পরিষ্কার করেন, তিনিই প্রথম এই আলতা পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। তিনিই নাকি ঐ আশ্চর্য ঘটনা দেখে হতবাক হয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডেকে দেখান। দৃশ্যত মনে হয় যেন মা দুর্গা স্বশরীরে পুকুরে স্নান করে আলতা পড়া পায়ে রাত্রি বেলা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। দূর দূরান্তে এই প্রচার ছড়িয়ে পড়ে, মন্দিরে ভিড় জমে যায়। প্রণামী পরে কয়েক হাজার টাকা।

এই ঘটনার দুদিন পরে আমরা বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গের আমতা ইউনিটের সদস্যরা টীম করে অনুসন্ধানে যাই। আমরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে নানা রকম বক্তব্য শুনতে পাই। কেউ বলেন স্বাভাবিক অবস্থায় মাটির উপর দিয়ে হাঁটলে দু-চার পা যাওয়ার পর আলতা অস্পষ্ট হবে অথবা মুছে যাবে। এছাড়া মন্দিরের ভিতরে ঢোকার দরজায় তালা দেওয়া সত্বেও ভিতরে পায়ের ছাপ এলো কি করে? এই ঘটনার নাকি লৌকিক ব্যাখ্যা হয় না। আমরা ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া প্রচারেও দেখেছি যে লাল রঙের দু-পায়ের ছাপ অতি স্পষ্ট এবং তা সমদূরত্ব মেনেই আছে। এছাড়া ভিতরের ঢোকার পথে গেটে তালা ঝুলছে। এমন অলৌকিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি এটাও শোনা গেছে যে পূজোটা অনেকদিনের পুরানো এবং ম্যার ম্যারে হয়ে গেছে। এই অবস্থাকে সজীব করতে পরিকল্পনা করে ঘটনা সাজানো হয়েছে। এই শেষ বক্তব্য মন্দির প্রাঙ্গনে পাওয়া যায় নি, কিছুটা দূরে পথচলতি মানুষের কেউ কেউ এমন কথাও বলছেন।

আমরা ঘটনাস্থলে দেখি যে পুকুর ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত যে অংশটা মাটির, সেখানে আলতা ছাপ অস্পষ্ট, তবে মন্দিরের দালানে পায়ের ছাপ স্পষ্ট। উভয় ক্ষেত্রে লাল আলতার ছাপ একইরকম উজ্জ্বল হয় নি। এছাড়া আলতার ছাপের পাশাপাশি কোথাও কোথাও ফোঁটা ফোঁটা আলতা পড়ে আছে। এই আলতার ফোঁটা প্রসঙ্গে কিছু লোককে জিজ্ঞাসা করায় কয়েকজন মহিলা জড়ো হয়ে বলেন – 'ওসব বলবেন না, আমাদের মা খুব জাগ্রত।' একজন বললেন – 'আমি এসব মানতাম না, এই ঘটনা দেখে আমার বিশ্বাস পাল্টে গেছে'। একজন বলেন যে অলৌকিকতা না থাকলে তালাবন্ধ ঘরে মা ঢুকলেন কি করে? ওনাকে গণেশের দুধ খাওয়া, রাজবোলহাটের রাজবল্লভীর ঘটনার কথা উল্লেখ করলে বলেন – 'এসব বলতে পারবো না।' উনি এড়িয়ে গেলেন।

সমস্ত ঘটনা অনুসন্ধান করে আমরা বলতে চাই বিজ্ঞান মনস্কতায় অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই। রাতের অন্ধকারে তালা খুলে কি আলতা পায়ের ছাপ ফেলা যায় না? অলৌকিক ব্যাপার ঘটলে মন্দিরের দালানে পায়ের ছাপ মাটিতে থাকা পায়ের ছাপের থেকে বেশি স্পষ্ট কেন? জায়গায় জায়গায় আলতার ফোঁটা কেন থাকবে? প্রায় সমদূরত্বের ব্যবধানে ডান ও বাঁ'পার ছাপ ফেলতে গেলে যথেষ্ট সতর্কতা থাকতে হবে। তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে গেলে মন্দিরের পূজা পাঠের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এই সাজানো ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। ফরেনসিক বিজ্ঞান এই পায়ের ছাপ আজকের যুগে সহজেই নির্ণয় করতে পারে, যদি প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকে।

তাই সংবিধানে যেখানে অলৌকিক মিথ্যা প্রচার নিষিদ্ধ, সেখানে পুলিশ-প্রশাসনের কাজ ছিল জনমনের এই হিস্টিরিয়া রোগমুক্তির জন্য তদন্ত কমিটি গড়ে অসাধু কারবারিদের ধরা। কিন্তু প্রশাসনের এই নিষ্ক্রিয়তা এটাই তুলে ধরে যে অলৌকিক ধারণাকে টিকিয়ে রাখে শাসকরাই। ■

অতিথি কলম ঃ

চোখ – আমাদের মনের জানালা

– শুভময় দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত Optometrist

(তৃতীয় অংশ)

বহির্জগতকে জানতে স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রয়োজন। মনের জানালা যদি অস্বচ্ছতার আবরণে আবৃত হয়ে যায় তবে যেমন দৃষ্টির সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে কোন ধারণাও গড়ে ওঠে না। তাই চোখের যত্ন নিন। আর যত্ন নিতে জেনে নিন শরীরের এই অংশের গঠন, কার্যকারিতা, সমস্যা এবং সমস্যা দূরীকরণের কিছু কথা।

ড্রাই আই থেকে রাতকানা

দুটো চোখ আমাদের মাথার সামনের দিকের উপরের অংশে অস্থি নির্মিত অক্ষিকোটরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। উপরে কপাল মাঝখানে নাক, নীচে মুখ। চোখের উপরে দুটো লোমোশ ভুরু চোখের মধ্যে জল গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে। চোখ দুটো অক্ষিপল্লব দ্বারা ঢাকা থাকে। যা পেশী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিছু দেখতে হলে চোখের পাতা খুলতে হয়। হঠাৎ বেশি আলো বা অন্য কিছু চোখের উপর পড়লে তা নিজেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বন্ধ হয়ে যায়। চোখের উপরের পাতার নাকের দিকের কোনায় অশ্রু গ্রন্থি থাকে। সর্বক্ষণ তা থেকে অশ্রু বা চোখের জল উৎপন্ন হয়। আবার চোখের কোনায় অবস্থিত দুটো ছিদ্র নিয়ে নেত্রনালী হয়ে তা নাকের ভেতর দিয়ে পেটে চলে যায়। এই অশ্রু চোখের সামনের অংশকে ভিজিয়ে বা ময়েশ্চারাইজ করে রাখে। এর থেকে কর্নিয়ার পুষ্টি সাধন হয়। অশ্রুর মধ্যে জল আর তৈলাক্ত পদার্থ চোখকে নরম রাখতে সাহায্য করে। কোন সমস্যায় অশ্রু উৎপাদন কম হলে চোখের শুষ্কতা দেখা যায়। একে বলে ড্রাই আই। বয়সজনিত কারণে বা বেশিক্ষণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে যারা থাকেন অথবা কম্পিউটারের পর্দায় দীর্ঘক্ষণ যাদের কাজ করতে হয় তারা ড্রাই আইতে আক্রান্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে কৃত্রিম অশ্রু বা টিয়ার আই ড্রপ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যবহার করে চোখকে ভেজা অবস্থায় রাখতে হয়। না হলে চোখের কর্ণিয়া শুষ্ক হয়ে গভীর সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আবার বাচ্চাদের ভিটামিন 'এ'র অভাবেও এই শুষ্কতা হতে পারে। এমন কি তা থেকে বাচ্চাদের রাতকানা রোগ হতে পারে। একে বলে ক্যারেটোম্যালেশিয়া। বেশিদিন এভাবে থাকলে তা থেকে স্থায়ী অন্ধত্ব হতে পারে। যেসব বাচ্চারা পেটের অসুখে বা কৃমির আক্রমণে বেশি ভোগে তাদের এই সম্ভাবনা বেশি হয়। এর সমাধান হল বাচ্চাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়ানো এবং ভিটামিন এ যুক্ত খাদ্য নিয়মিত দেওয়া। আমাদের জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত ডি ওয়ারমিং আর ছয় মাস অন্তর একচামচ ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার ফলে বর্তমানে এই রাতকানা রোগ অনেকটাই কমে এসেছে। অন্তত আমাদের রাজ্যে।

নীরব ঘাতক গ্লুকোমা

আমাদের অক্ষিগোলকের মধ্যে সর্বদা অ্যাকুয়াম হিউমার নামে এক রকম জলীয় তরল তৈরি হয়। তা চোখের প্রেসার নির্দিষ্ট রাখে। অনেকটা ফুটবল বা গাড়ির টায়ারের পাম্প দেওয়ার মতো। না হলে বায়ুমণ্ডলের চাপে অক্ষিগোলক চুপসে যেত। আবার এই তরল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি অংশ বেরিয়ে যায়। না হলে চক্ষুগোলক বাড়তি চাপে শক্ত হয়ে যাবে। এই চাপে শক্ত হয়ে পেছনে অবস্থিত রেটিনার নার্ভ – যা ইমপালসের মাধ্যমে দর্শনীয় বস্তুকে মস্তিষ্কে নিয়ে যায় তা অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে অন্ধত্বে পৌঁছে যাবে। এই রোগ খুবই মারাত্মক। একে বলে গ্লুকোমা। ক্রনিক গ্লুকোমাতে প্রথম দিকে কোন উপসর্গ থাকে না। বেশি বেড়ে গেলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে পাশের দিকের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। চোখের প্রেসার মাপার যন্ত্র হলো টোনোনোমিটার। যেমন ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র স্ফিগমোম্যানোমিটার। এই রোগ বেশ খানিকটা বংশগত হয়। তাই বংশের কারো এই রোগ থাকলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ গ্লুকোমাতে দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে তা চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যায় না। ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি আটকাতে চিকিৎসা চলতে থাকে। তাই একে নীরব ঘাতক বলা হয়। এই রোগ হলে নিয়মিত ওষুধের মাধ্যমে চোখের প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

ছানির হাতছানি

আমাদের চোখের ভিতর মাঝখানে লেন্স থাকে। দৃষ্টিশক্তিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই লেন্স প্রোটিন দিয়ে তৈরি। সুসংবদ্ধ কেলাস আকারে সাজানো থাকে। তাই এর মধ্য দিয়ে আলো সহজেই চলাচল করতে পারে। কাঁচ ভেঙে গেলে যেমন হয় তেমনি লেন্সের ভিতরে পরিবর্তন হলে তা অস্বচ্ছ হয়ে যায়। দৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। ওষুধের মাধ্যমে এর কোন চিকিৎসা নেই। লেন্স আস্তে আস্তে আংশিক বা সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে গেলে এর ভিতর দিয়ে আলো চলাচল করতে পারে না। একে ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলে। সারা পৃথিবীতে অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি। কিন্তু অপারেশনের মাধ্যমে এই অন্ধত্ব সম্পূর্ণ দূর করা যায়। লেন্সের সামনের অংশ বের করে এনে সেই পাওয়ারের কৃত্রিম লেন্স পুরনো স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়। চোখের অন্য অংশে কোন অসুবিধা না

থাকলে ছানি অপারেশনের পরে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ফিরে আসে। জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচির অধীন এই প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রোগীর অপারেশনের ব্যবস্থা আছে। সাধারণত একবারে একটি চোখে অপারেশন করা হয়। কয়েক দিন পর প্রয়োজন মত অন্য চোখে অপারেশন করা হয়।

ডায়াবেটিস ... কনজাংটিভাইটিস

দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগলে রেটিনার পর্দায় পরিবর্তন আসতে পারে। একে বলে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। এর ফলেও দৃষ্টির প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের থেকেও চোখের রেটিনার শিরা ছিঁড়ে হ্যামারেজ হতে পারে। তাই উচ্চ রক্তচাপের এবং ডায়াবেটিসের রোগীদের বছরে অন্তত একবার চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এছাড়াও নানা রকম সংক্রমণেও চোখের রোগ হতে পারে। কনজাংটিভা'তে প্রদাহ হলে লাল চোখ বা কনজাংটিভাইটিস হয়। সাধারণত এতে চোখের দৃষ্টির ক্ষতি হয় না। তবে তার সাথে কর্ণিয়াতে ঘা হলে সঠিক সময়ে ঠিকমতো চিকিৎসা না করালে দৃষ্টিশক্তির গুরুতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনকি অন্ধত্ব আসাও বিচিত্র নয়।

অতিরিক্ত জল পড়া

চোখের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলে চোখ সম্পর্কে আরো অসংখ্য তথ্য আমরা পেতে পারি। তাই আঁখিপল্লব নিয়ে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন। চোখের বাইরের দিকে আঁখিপল্লব বা চোখের পাতা হল পাতলা চামড়ার পর্দা। চোখকে অতিরিক্ত আলো, ধুলোবালি আর আঘাত থেকে রক্ষা করে। এতে পেশী থাকার কারণে দুটি পল্লবই খোলা বন্ধ করা যায়। আর চোখের পাতার পেছনের অংশ যা সব সময় চক্ষুগোলককে ছুঁয়ে থাকে তা হল কংজানঙ্কাটিভা। চোখের পাতার নাকের দিকে ও উপরে ও নিচে দুটি ছিদ্র থাকে। ওপরের পাতার কানের দিকে ভিতরের অংশে থাকে অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাকারিমাল গ্ল্যান্ড। এই গ্রন্থি থেকে সবসময় অশ্রু তৈরি হয় এবং নির্গত হয়। এই অশ্রু চোখকে আদ্র রাখতে সাহায্য করে। এতে একরকম উৎসেচক থাকে যার জীবাণু নাশক ক্ষমতা আছে আর সামান্য তৈলাক্ত পদার্থ ক্ষরিত হয় যা লুব্রিক্যান্টের কাজ করে। চোখের কর্নিয়ার পুষ্টি সাধনে এই অশ্রুর ভূমিকা আছে। নাকের দিকে দুটি ছিদ্র নলের সাহায্যে নেত্রনালীর সঙ্গে যুক্ত। নেত্রনালী আবার নাকের সঙ্গে যুক্ত। অতিরিক্ত অশ্রু এই নেত্রনালী দিয়ে গলার মাধ্যমে পেটে চলে যায়। এজন্যই চোখে কোন ড্রপ দিলে আমাদের গলায় নোনতা স্বাদ লাগে। এই নেত্রনালী এবং এর সংলগ্ন অঞ্চল কোন কারণে জীবাণু আক্রান্ত হলে ফুলে ওঠে। পুঁজ জমে খুব ব্যথাও হতে পারে। এই রোগ মহিলাদের বেশি দেখা যায়। ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা হলে কমে যায়। কিন্তু বারবার আক্রান্ত হলে নেত্রনালী স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে নেত্রনালী বাদ দিতে হয়। সেখানে কৃত্রিম নেত্রনালী বসানো হয়। না হলে সারা জীবন ধরে চোখে অতিরিক্ত জল পড়ার সমস্যা থাকে।

উল্টো আইল্যাসের সমস্যা

চোখের পাতায় আইলাস বা ছোট ছোট রোম বা চুল থাকে। এই চুল বাইরের দিকে মুখ করে থাকে। আর আমাদের ভুরুতেও চুলের গোছা থাকে। কপাল বা মাথা থেকে জল পড়লে পাশ দিয়ে গড়িয়ে যায়। চোখে সরাসরি পড়ে না। আইল্যাসও ধুলাবালি, জল থেকে চোখকে রক্ষা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আঁখিপল্লব ভিতরের দিকে অর্থাৎ উল্টো দিকে ঢুকে থাকে। চোখের কর্ণিয়ায় ঘষতে থাকে। তা থেকে কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই এই উল্টো আই ল্যাস নিয়মিত চিমটার মাধ্যমে তুলে ফেলতে হয়।

আরও কয়েকটা সমস্যা

চোখের পাতায় প্রদাহ চোখের আরেকরকম সমস্যা। একে বলে ব্লেফারেটিস। অনেকটা খুশকির মত সাদা সাদা গুড়ো গুড়ো বস্তু জমতে দেখা যায়। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রোগ খুবই পরিচিত। বিশেষ করে শীতকালে যখন বাতাসে আদ্রতা কম থাকে। এক্ষেত্রে মুখে, চোখের পাতায় কোল্ডক্রিম লাগালে উপকার হয়। আর চুলে খুশকি থাকলে তা কমিয়ে ফেলতে হবে। চোখের পাতার আরেকটি অসুখ যা হল আঞ্জনি বা হোর্ডিয়োলাম। একটু ফুলে থাকা ছোট্ট ফোঁড়ার মতো। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যথাও থাকে। লার হতে পারে। সাধারণত স্টেপ্টোককৃমি জীবাণুর আক্রমণে হয়। বড়দেরও এই রোগ হতে পারে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে গরম জলে সেঁক দিলে কাজ হয়। তা না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হয়। তবে ব্লেফারেটিস আর আঞ্জনি অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়ারের সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে। বারে বারে এই সমস্যা হলে পাওয়ার পরীক্ষা করে সঠিক চশমা নিলে সমাধান হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই চোখ পরিষ্কার করার জন্য ঘনঘন চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে থাকেন। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ অতিরিক্ত জলের ঝাপটায় উৎসেচক ধুয়ে যায়। চোখের জলের জীবাণুনাশক ক্ষমতা কমে যায়। তবে চোখে ধুলোবালি বা কোন তরল পদার্থ পরলে জল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলতে হবে। হাত দিয়ে বারেবারে কচলানো উচিত নয়। কারণ ধুলোর টুকরো ঘষে কনজাঙটিভার ক্ষতি হতে পারে। রৌদ্রে বের হলে অনেকের চোখে কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে রোদচমশা ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজল, সুরমা থেকে এলার্জি হওয়াটা খুবই সাধারণ ঘটনা। তাই মেকআপ করার সময় তা যাতে চোখে না ঢুকে যায় তার খেয়াল রাখতে হবে। কৃত্রিম আঁখিপল্লব ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

চোখের এই প্রকার সমস্যাগুলো তুচ্ছ ভাবলে মারাত্মক ভুল হবে। এগুলো মোটেও তুচ্ছ নয়। এসব সমস্যাও দৃষ্টিশক্তিতে স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

তাই চোখের দৃষ্টির স্বচ্ছতার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করান। ■

বিজ্ঞানের খবর

অগাস্ট, ২০২৩

১. ●জীব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে কোনো গ্রহের বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণের উপর সেই গ্রহে উন্নত সভ্যতা বিকাশের সম্ভাবনা নির্ভর করে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বায়ুমন্ডলে মুক্ত দহনের জন্য বায়ুতে অক্সিজেনের অংশচাপ ন্যূনতম ১৮% হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই কারণেই পৃথিবীতে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। একই কারণে, আগুনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে ও প্রযুক্তিগত সভ্যতার বিকাশ ঘটে চলেছে। (অ্যাস্ট্রোবায়োলজি ডট কম)

২. ●বর্তমান পৃথিবীতে জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ হল নীল তিমি। যার সর্বাধিক প্রাপ্ত ওজন হল ২০০ টন। সম্প্রতি, ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্মবিদেরা জানাচ্ছেন, প্রায় এক দশক আগে পেরুর একা মরুভূমি থেকে প্রাপ্ত একটি তিমি জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম থেকে জানা যাচ্ছে জীবিত অবস্থায় তার ওজন আনুমানিক ৩৭৫ টন। ইয়োসিন যুগের এই প্রাণীটিই এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। (নেচার)

৩. ●২০২১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাজিল থেকে প্রাপ্ত 'ডগজিম' প্রজাতির কুকুর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে সেটি একটি প্রাকৃতিক সংকর প্রজাতির কুকুর যা প্যামপাস খ্যাকশিয়াল ও গৃহপালিত কুকুরের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এই রকম ঘটনা বিজ্ঞানীরা প্রথমবার লক্ষ্য করলেন। (অ্যানিম্যাল)

৮. ●২ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে দৈনিক ন্যূনতম ৩ হাজার ৯৬৭ পা হাঁটলে মানুষের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস করে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা সম্ভব। ২৩০০ পা বা তার অধিক হলে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালী সংক্রান্ত সমস্যা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব। এর সংখ্যা যত বৃদ্ধি করা যাবে উপকারের মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে। পূর্বের ধারণা অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরীক্ষার ফলাফলকে অনুমোদন করেছে। (বিবিসি)

১১. ●বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পেলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে গাছেরা সালোকসংশ্লেষ বা অঙ্গারাত্তিকরণের হার বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে এই শতাব্দীর শুরু থেকে বিশ্বব্যাপী সালোকসংশ্লেষের হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ক্রমশঃ শুষ্ক হয়ে যাওয়াকেই দায়ী করেছেন। (নেচার)

১৭. ●একদল মার্কিন বিজ্ঞানী বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলার জন্য সেই দেশে ক্লাইমেট ফিনান্স চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ১৯৯০ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা কোন স্তরের নাগরিক বাতাসে কার্বন নিঃসরণের সঙ্গে কতটা যুক্ত রয়েছেন তা নির্ণয় করেছেন ও সেই নিরীখে কার্বন-কর বা দূষণ-কর চালু করার প্রস্তাব জানিয়েছেন। (পিএলওএস ক্লাইমেট)

১৮. ●প্রাণীজ সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন প্রাণীজ সম্পদ সৃষ্টির উপর অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার। এমনকি প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণ হ্রাস করাও প্রয়োজন। তবে জলবায়ু পরিবর্তনে কিভাবে ও কতটা ভূমিকা রাখে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। (ওয়ান আর্থ)

২৩. ●ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো তার চন্দ্রায়ন-৩ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। ইসরো'র বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান বিক্রমকে চন্দ্রপৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ করাতে সমর্থ হয়েছে। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম কোন মহাকাযানকে চাঁদের উত্তর মেরুতে অবতরণ ঘটাতে সফল হল। (ইসরো)

৩১. ●২০২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৮০০ কোটি ছাড়িয়েছে। সম্প্রতি চীনা গবেষকরা জানাচ্ছেন যে প্রায় ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে মানুষের পূর্বপুরুষের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে ৯৮.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল ও মনুষ্য প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় বলেছেন যে সেই সময় মাত্র ১২৮০ জন প্রজননক্ষম মানুষ বেঁচে ছিল ও প্রায় এক লক্ষ বছর এই অবস্থা বিরাজ করেছিল। পরবর্তীকালে এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বিশেষ পরিস্থিতির ফলে আদিম মনুষ্যপ্রজাতি নিয়ানডারথাল ও আধুনিক মানুষ এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

সেপ্টেম্বর

২. ●মহাকাশের জন্ম কি ভাবে হল? কেমন ছিল শৈশব, তার বেড়ে ওঠা? সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।

সেই থেকে একের পর এক মহাকাশের অতীতের ছবি পাঠিয়ে মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে সে। কিন্তু ঐ টেলিস্কোপের পাঠানো তথ্য ও মহাকাশ সম্বন্ধে অতীতের জ্ঞান নিয়ে নভোপদার্থ বিজ্ঞানীদের বানানো 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল অব কসমলজি'-র মধ্যে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে নির্দিষ্ট সময় রেখায় মহাকাশের অবস্থা যেমন ধারণা করা হয়েছিল টেলিস্কোপ প্রেরিত তথ্য কিন্তু অন্য কথা বলছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন মডেলের ত্রুটির কারণেই এই দ্বন্দ্ব, এই ত্রুটি সংশোধন করে এগিয়ে যাওয়াই এখন লক্ষ্য। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৬. ●আমেরিকার ভূতত্ত্ববিদেরা জানিয়েছেন যে আমেরিকার নেভাডা-ওরেগন সীমান্তে এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি সংলগ্ন খাদে প্রচুর পরিমাণ লিথিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার গচ্ছিত পরিমাণ আনুমানিক ২০-৪০ মিলিয়ন টন। এখন পর্যন্ত এটাই লিথিয়ামের বৃহত্তম প্রকৃতিক সঞ্চয় যা লিথিয়ামের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করবে। (কেমিস্ট্রি ওয়ার্ল্ড)

৭. ●তেল আভিব বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক পুরানো প্রস্তরযুগে শিকারের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে জানানো হয়েছে ঐ সময় থেকে শিকারের আকার ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাবার জন্য অস্ত্রের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ও মানুষের বৌদ্ধিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (তেল আভিব বিশ্ববিদ্যালয়)

১১. ●সম্প্রতি 'কে২-১৮বি' নামক একটি বহির্গ্রহের সন্ধান পেয়েছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। বহির্গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় ৮.৬ গুণ ভারী ও তার বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে ১২০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত বহির্গ্রহটিতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ও জলের সমুদ্র রয়েছে। (নাসা)

১৪. ●জিনগত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি সামুদ্রিক জীবাণু তৈরী করেছেন যা কৃত্রিম পলিমারকে ভেঙ্গে দিতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন জীবাণুটি সমুদ্রের লবণাক্ত জলে পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট (পেট) নামক প্লাস্টিকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। জলের বোতল, পোশাক ইত্যাদির অন্যতম প্রধান উপকরণ এই পলিমারটি সমুদ্রের জলের অন্যতম দূষণ সৃষ্টিকারী মাইক্রোপ্লাস্টিক। (এনসি স্টেট ইউনিভার্সিটি)

●বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে সমুদ্রের জলের তুলনায় নদীর জল দ্রুত গরম হয় ও দ্রুত অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। ৮০০টি নদীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৮৭% নদীর জল সমুদ্রের জলের তুলনায় দ্রুত উষ্ণ হচ্ছে ও প্রায় ৭০% নদীর জল সমুদ্রের জলের তুলায় দ্রুত অক্সিজেন বর্জন করছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন এটা চলতে থাকলে নদীর বাস্তুতন্ত্র দ্রুত পরিবর্তনের মুখে পড়বে। (পেন্সিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি)

১৮. ●ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা এক ধরনের এক্স-রে আবিষ্কার করেছেন যা পূর্বের তুলনায় ৮ হাজার গুণ দ্রুত ও প্রায় ১০ হাজার গুণ উজ্জ্বল। (ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি)

●বিজ্ঞানীরা ট্রিপল জাংশান সৌর কোষ-এ পেরোভস্কাইট-সিলিকন সাবসেল ব্যবহার করে মুক্ত-বর্তনীতে ২.৮ ভোল্ট উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণ প্রথাগত কোষ ০.৭-০.৮ ভোল্ট উৎপন্ন করতে সক্ষম।

২০. ●জাম্বিয়ার একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার বছরের পুরানো ব্যবহৃত কাঠের আসবাব আবিষ্কার করেছেন যা এখনো পর্যন্ত প্রাচীনতম বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন। (নেচার) ■

চিঠিপত্র ঃ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত ব্ল্যাকহোল সংক্রান্ত রচনাটি চমকপ্রদকভাবে বিস্ময়কর। আমি ব্ল্যাকহোলের প্রকৃতি, সৃষ্টি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে গভীর কৌতুহলী ছিলাম।

আপনাদের রচনাটি হল চোখ খুলে দেওয়ার মত এবং এত সহজ সরল যে আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষেও তা বোঝা অত্যন্ত সহজ।

সমীক্ষণের সংখ্যাগুলি আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। প্রকাশককেও ধন্যবাদ এমন অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ম্যাগাজিন প্রকাশ করার জন্য।

আমাকে আলোকিত করার জন্য লেখককেও ধন্যবাদ

ধন্যবাদান্তে
অয়ন ভট্টাচার্য
১২/১১/২০২৩

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

কৃষিতে সার, কীটনাশক প্রয়োগ – পরিবেশে প্রভাব ও প্রতিকার

(দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)

গত সংখ্যার এই কলামে পৃথিবীতে কৃষির প্রচলন, কৃষি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, মৃত্তিকা রসায়নের বিকাশ ও কৃষিতে তার প্রয়োগ, মৃত্তিকা কি ও তার উপাদানসমূহ, উদ্ভিদের পুষ্টি বলতে কি বোঝায়, কীটনাশক, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সারের আবিষ্কার ও কৃষিজমিতে তার ব্যবহারের সূচনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। বিগত সংখ্যার আলোচনায় দেখা গেছে, মৃত্তিকা রসায়ন ও কৃষিবিজ্ঞানের বিকাশ মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে, এক-ফসলী জমিকে ক্রমশঃ দুই-ফসলী, তিন-ফসলী, এমনকি চার-ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা দেখিয়েছে। জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরতাকে ফিরিয়ে আনা নিশ্চিত করেছে। পতঙ্গবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে উপকারী কীটপতঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের নিয়ন্ত্রণ করা সক্ষম হয়েছে। এক কথায়, বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে সমাজের খাদ্য সমস্যা দূর করার পথ দেখিয়েছে, অন্যদিকে, পরিবেশের ক্ষতিসাধন না করেও সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদির বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব তার পথ দেখিয়েছে। কিন্তু পরিবেশবাদীরা এর বিপরীতে লাগাতার প্রচার করে চলেছেন যে কৃষিতে কৃত্রিম সারের ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে জলসেচ, উচ্চফলনশীল বীজ এবং কীটনাশকের ব্যবহারে জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে নাকি ক্রমশঃ কৃষির অযোগ্য হয়ে পড়ছে, ভূগর্ভস্থ জলভান্ডার নিঃশোষিত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলের আকাল তৈরি হয়েছে এবং বিষাক্ত কীটনাশকের প্রভাবে ফসলের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনই ক্যানসারসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। বলা হচ্ছে যে লাগাতার কৃত্রিম অজৈব সার ব্যবহারে জমি তীব্র লবণযুক্ত এবং চরম অনুর্বর হয়ে পড়ছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনের সর্বনাশ হবে। প্রাচীন প্রথাগত বীজের সাহায্যে চাষ না করে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার অতি উচ্চমাত্রায় জলশোষণ করে সেই জলরাশি অন্যত্র চালান হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশবাদীদের দ্বারা উত্থাপিত এই বক্তব্যগুলির জবাব অবশ্যই দেওয়া হবে, তার আগে কৃষিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের অসমতার প্রশ্নটি চর্চা করা দরকার।

কৃষিতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বাস্তব সাফল্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র তা প্রযুক্ত হচ্ছে না কেন? কোন কোন শর্ত পূরণ করলে তবেই বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব? যেখানে যেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে সেখানকার পরিস্থিতি কি? রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে – এই তত্ত্বের প্রচারকারীরা এই সমস্যার কি কি সমাধান দিচ্ছেন? সেই সমাধানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ও তা প্রয়োগ করে কি ফলাফল পাওয়া গেছে? এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান।

অজৈব সারের যথেচ্ছ ব্যবহার কেন হচ্ছে

ভারত সহ পৃথিবীর সমস্ত দেশে যেখানে যেখানে ব্যক্তিমালিকানায় ছোট বা মাঝারি পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদন হয়, সেই সমস্ত জায়গায় বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ সংগঠিত করা কি সম্ভব? পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে চাষের আগে মাটির যথাযথ রাসায়নিক পরীক্ষা করে পুষ্টির স্তর নির্ণয় করা প্রয়োজন ও নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে জমির মাটি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। জমিতে কি ধরনের আগাছা রয়েছে ও তা নির্মূল করতে কোন্ আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নেওয়া দরকার। ফসলে কোন পোকা আক্রমণ করলে তার স্বরূপ জেনে নিয়ে তা দমন করা দরকার। একটি ফসল জমি থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পরের ফসলের জন্য মাটি দ্রুততার সঙ্গে তৈরী করা দরকার। এই কাজগুলি সুষ্ঠভাবে করতে বিশেষজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানীর পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন। কেবলমাত্র কৃষকদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলির যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব নয়। ভারতে কৃষি বিজ্ঞানী নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারী পরিকল্পনায় প্রত্যেক জেলায় একটি করে কৃষি বিজ্ঞানীর পদ আছে। বর্তমানে দেশে মোট জেলার সংখ্যা ৭৯৪, আর কৃষি বিজ্ঞানী পদে নিযুক্ত আছে ৭৩১ জন। অর্থাৎ ৬৩টি জেলায় কোন কৃষি বিজ্ঞানী নেই। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাজ হল কৃষি জমির মাটি পরীক্ষা করা, কৃষকদের প্রশিক্ষন দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া, নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের অবগত করা ইত্যাদি। এই সকল সরকারী কর্মসূচীতে কৃষকদের আগ্রহ প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ ক্ষুদ্র

কৃষকেরা মূলতঃ নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চাষ করে থাকেন ও তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করে লাভের আশায় চাষ করেন। যৎসামান্য সরকারী সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন। বিভিন্ন সার ও কীটনাশক প্রস্তুতকারী কোম্পানীর প্রতিনিধিদের পরামর্শ মতো নিজ নিজ জমিতে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করেন। সঠিক পরিমাণে সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার না হওয়ার ফলে তার কুপ্রভাব যে শুধুমাত্র চাষীর নিজের জমিতে পড়ে এমন নয়, পারিপার্শ্বিক জমি, খাল-বিল-নদী-নালা সর্বত্রই এতে প্রভাবিত হয়। বর্ষায় জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক প্লাবিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোন একটি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক আশপাশের জমির ফসলের জন্য অপ্রয়োজনীয় হলে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর ফলে, উপকারী অনুজীব ও কীট-পতঙ্গ যেমন একদিকে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, অন্যদিক অপকারী জীবকুল বিভিন্ন রাসায়নিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আর সেই প্রতিরোধ জিনগত (মিউটেশন) হলে তার পরিণতি কিন্তু ভয়ঙ্কর। অজানা ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে ফসলের ক্ষতি হওয়ার ঘটনা মাঝেমাঝেই শোনা যায়। এর ফলে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ও পরবর্তী চাষ বিলম্বিত হয়। এর চটজলদি সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রশাসনের কাছে নেই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য কৃষকেরা সরকারের দ্বারস্থ হন। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাওয়ার গেলেও মূল সমস্যার সমাধান হয় না। এই অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার কুফল ভোগ করেন দেশের কৃষক সম্প্রদায় বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা। কোন বছর ফসল ভাল হয় তো কোন বছর মন্দ। উৎপাদন ভাল হলেও বাজারে লাভজনক মূল্যের ক্রেতা না পেয়ে আর্থিক ক্ষতির কবলে পড়তে হয় বা ফসল জমিতেই নষ্ট করে দিতে হয়। ঋণের দায়ে কৃষকদের আত্মহত্যা করার ঘটনাও বিরল নয়।

তাহলে সমস্যার উৎস কোথায়?

আলোচনায় দেখা গেল, ভারতসহ বহু দেশেই, কৃষিভিত্তিক পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত সমস্যাসহ দেশের কৃষিব্যবস্থার সকল সমস্যার উৎস কৃষি ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ভারতসহ বর্তমান পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কৃষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন বিরাজ করছে। ভারতের ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একাংশের মতো কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত বাকি সমস্ত রাজ্যেই ক্ষুদ্র মালিকানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষ হয়ে থাকে। কি পরিমাণ জমিতে কোন্ ফসল কি পরিমাণে চাষ হচ্ছে, উৎপাদন কতটা হচ্ছে, বাজারের চাহিদা কত, তার সঠিক পরিসংখ্যান সরকারের কাছে থাকে না। এদিকে বিজ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশের ফলে অতিউৎপাদনশীল বীজ, উন্নত সার, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকছে। একদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদন আর অন্যদিকে শস্য গুদামে ফসল নষ্ট হচ্ছে। এটাকেই বলা হয় অতি উৎপাদন সংকট যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বাজারের চাহিদার তুলনায় ফসলের উৎপাদন অতিরিক্ত হওয়ার ফলে কৃষকেরা পণ্যের সঠিক দাম পান না। তাই ছোট, বড়, মাঝারি কৃষক এমনকি খামার মালিকদের প্রধান দাবিই হল তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পাওয়া। তারা সরকারের কাছে এই দাবিই করে থাকে। পরিকল্পনাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফল হল সামাজিক বিশৃঙ্খলা। এই বিশৃঙ্খলা স্থায়ীভাবে দূরীকরণের কোন দাওয়াই এই ব্যবস্থার পরিচালকদের কাছে নেই।

তাই বলে নীরব থাকা তো যায় না ...

সম্প্রতি নয়াদিল্লীর জি-২০ সম্মেলনে দেশের কৃষি সমস্যার কথা বলতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমারী, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রধানভাবে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের নীতি মৌলিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া (ব্যাক টুক বেসিকস) এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া (মার্চ টু ফিউচার)-র মিশ্রণ। আমরা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি কাজে কৃষকদের উৎসাহিত করছি। ... তারা কৃত্রিম সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছেন না। বসুন্ধরা মাতার পুনরুজ্জীবন, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা, এক ফোঁটা জলে অধিক শস্য উৎপাদন ও জৈব সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার দিকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন। ..." তিনি ভাষণে উপস্থিত সকল রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের বিশ্বের খাদ্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন।

জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহারের পক্ষের যে সমস্ত যুক্তিগুলি পরিবেশবাদীদের দ্বারা সাধারণত বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয় সেগুলি হল ঃ– (১) জৈব চাষ লাভজনক তাই চাষীদের আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, (২) জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলে ক্ষতিকর রাসায়নিক অনুপস্থিত থাকে ও পুষ্টিগুণ অধিক, (৩) জমির স্বাস্থ্য রক্ষা করে, (৪) জীব বৈচিত্রের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না, (৫) গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গত করে না তাই জলবায়ু পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখে না – ইত্যাদি।

বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা জৈব চাষের সপক্ষে ওকালতি চালিয়ে গেলেও ভারতসহ পৃথিবীর সমস্ত অজৈব সার উৎপাদনকারী দেশগুলিতেই সারের উৎপাদন গত দশ বছরে লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জৈব চাষের সীমাবদ্ধতা

জৈব চাষে চাষীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল কি বলে? (১) প্রয়োজনীয় মৌলগুলির অনুপস্থিতিতে জৈব চাষে উৎপাদিত ফসলের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, মাটি তৈরীতে প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময়। (২) সে কারণে, জৈব ফসলের বাজারী মূল্য অত্যাধিক। (৩) ভারতের মতো দেশগুলিতে যেখানে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম সেখানে জৈব ফসলের বাজার অত্যন্ত সীমিত, তাই অলাভজনক। সেই কারণে জৈব চাষে কৃষকরা উৎসাহিত হন না। অনেক ক্ষেত্রে, জৈব-অজৈব মিশ্র সারের কথাও বলা হয়। (৪) জৈব সার যেহেতু মূলত প্রাণীজ বর্জ্য থেকে প্রস্তুত করা হয়, তাই এই সার ব্যবহার করলে জমিতে অত্যাধিক আগাছার জন্ম হয় যা নির্মূল করতে প্রয়োগ করতে হয় রাসায়নিকের। (৫) জৈব ফসলে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে এবং তা সুস্বাদু। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা এখনও প্রমাণিত নয়। (৬) অজৈব সার গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরী করে ও জৈব সার তা করে না এমন পার্থক্য রেখা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এখনও জানা যায়নি। (৭) পরিমিত সার ব্যবহারে তা সে জৈব হোক বা অজৈব, জীব-বৈচিত্র-র উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে গবেষণায় এখনও তা ধরা পড়েনি।

জৈব চাষের সপক্ষে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিশ্বব্যাপী যে প্রচার গত কয়েক দশক ধরে চলেছে তার ফলাফলের সারবত্তা হল বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ইউরোপের কিছু দেশ, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে বড় বড় ফার্মাররা ইতিমধ্যে জৈব চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বর্তমানের প্রথাগত চাষে পুনরায় মনোনিবেশ করেছে।

জৈব চাষ (Organic farming) এর প্রবক্তাদের প্রচারের জবাবে বলা যায় –

১. কৃষিতে কৃত্রিম সারের ব্যাপক আকারে প্রয়োগের সূচনা হয়েছে বিংশ শতকের শুরু থেকে প্রথমতঃ পশ্চিম ইউরোপের ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মত দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলিতে এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে। প্রায় শতাধিক বছর ধরে বিরাট বিরাট ফার্মে কৃত্রিম সারের ব্যবহারের পর তো ওইসব দেশের কৃষিব্যবস্থা এতদিনে (পরিবেশবাদীদের কথা সত্যি হলে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তব কি তাই? ভারতের পাঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে কৃত্রিম সারের ব্যবহার হচ্ছে বিপুল আকারে। সাম্প্রতিককালে প্রায় ১ বছর ধরে দিল্লী সীমান্তে যে কৃষক আন্দোলনে পাঞ্জাব-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশসহ বিভিন্ন কৃষকরা যে আন্দোলন চালালেন তা কি জৈব চাষের দাবিতে বা কৃত্রিম সার প্রয়োগ করে কম ফসল উৎপন্ন হওয়ার কারণে? নাকি উৎপন্ন ফসলের লাভজনক মূল্য না পাওয়ার কারণে? সুতরাং পরিবেশবাদীদের প্রচার অবৈজ্ঞানিক এবং মিথ্যা। দেশের ব্যাপক কৃষক সমাজ ক্রমশ এই মিথ্যা প্রচারের সারবত্তা উপলব্ধি করছেন।

২. উচ্চফলনশীল বীজ এবং সেচের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদীদের প্রচারের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কৃত্রিম সার, উচ্চফলনশীল বীজ কীটনাশকের ব্যবহার ও আধুনিক সেচ অপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্তরূপে ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই ভারত ধান-গম উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে, ডাল উৎপাদনে ষষ্ঠ স্থানে। উচ্চফলনশীল বীজ, কৃত্রিম সার, কীটনাশক ব্যবহার করে একর পিছু উৎপাদন কোথাও ৬ গুণ, কোথাও ৮ গুণ, কোথাও ১০ গুণ হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার অতিরিক্ত জলশোষণ হয় এই যুক্তিও অমূলক। প্রথমতঃ ধান-গম এর মূল হল গুচ্ছমূল এবং তা মাটির গভীরে প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়তঃ ফলন ১০ গুণ হলে একই জমিতে জলের প্রয়োজন কিছুমাত্রায় বাড়াটা কি অস্বাভাবিক?

৩. আগেই বলা হয়েছে যে কৃত্রিম সার, উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ব্যবহারে ফসলের স্বাদ ও গুণমান নষ্ট হওয়ার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। সবটাই তথাকথিত অর্গানিক (জৈব) চাষ, অর্গানিক (জৈব) ফসলের বিজ্ঞাপণ। এই বিজ্ঞাপণে প্রতারিত উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত একটা বড় অংশ প্রতারিত হচ্ছেন।

৪. উচ্চফলনশীল বীজ, কৃত্রিম সার, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন ফসল এবং জমির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, এই ফসল খেয়ে সাধারণ মানুষ বা চাষ করার জন্য কৃষকদের ক্যানসারের মত কঠিন অসুখ হচ্ছে এবং তা মহামারির আকার ধারণ করেছে বলে পরিবেশবাদীদের প্রচার বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়।

মাটি পরীক্ষা না করে অতিরিক্ত বা কম সার (জৈব-অজৈব) ব্যবহার, সেচের অপ্রতুলতা, অবৈজ্ঞানিকভাবে কীটনাশকের ব্যবহার পরিবেশ তথা কৃষি উৎপাদনে সমস্যা সৃষ্টি করে। আর অপরিককল্পিত কৃষি উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ উৎপাদনে ঘাটতি সৃষ্টি করে থাকে। তবে ব্যাপক কৃষক সমাজের মূল সমস্যা অন্য।

তাহলে সমস্যার সমাধান কি?

দেখা গেছে, পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানভিত্তিক বৃহৎ খামার চাষের সঙ্গে যে সমস্ত কৃষিবিজ্ঞানী, চাষী, প্রযুক্তিবিদ বা বিভিন্ন সংস্থা যারা যুক্ত আছে তারা কৃষিতে সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি ব্যবহারের কুফল নিয়ে তেমন কোন অভিযোগ করেন না। কারণ, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃহদাকার খামারে কৃষিকাজ হয়ে থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি কাজের বহুল প্রচলন সর্বপ্রথম শুরু হয় ইউরোপ ও আমেরিকায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সময় থেকেই কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকে। পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞান, কৃষিপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ধারাবাহিক বিকাশ ঘটতে থাকে। উন্নত বীজ, উন্নত সার ও কীটনাশকের ব্যবহারও ক্রমশ শুরু হয়। পাকাপাকিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাওয়া দেশগুলিতে আরো বেশি বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করা শুরু হয় ও বাজারের প্রয়োজনে বিশালাকার জমিতে ব্যক্তি মালিকানায় খামার চাষ চালু হয়। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবার ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের জমির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও কৃষি শ্রমিকে পরিণত হয়। খামারের প্রতিটি বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য সুদক্ষ শ্রমিক, বিশেষজ্ঞ ও গবেষক নিযুক্ত করা হয়। ইউরোপীয় দেশগুলিতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯০ লক্ষাধিক এই রকমের খামার রয়েছে যার প্রায় ৯৫ শতাংশ পারিবারিক খামার হিসাবে চিহ্নিত। যে সমস্ত খামারে নিয়জিত কৃষি-শ্রমিকের অর্দ্ধেক বা তার বেশি সংখ্যক মালিক পরিবারের সদস্য সেগুলিকে পারিবারিক খামার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ইউরোপে মোট খামারের দুই-তৃতীয়াংশ-এর প্রতিটির জমির পরিমাণ ১২ একর বা তার কম। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট ভূমিস্থলের ৩৮ শতাংশ কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের বৃহত্তম খামারটি রয়েছে রোমানিয়ায়, যার মালিক সংযুক্ত আমিরশাহী-র এক বৃহৎ কোম্পানী 'এগ্রিকস্ট'। এই সুবিশাল খামারের মোট আয়তন প্রায় ১.৪৫ লক্ষ একর, ৬০ কিমি লম্বা ও ১১ কিমি চওড়া। গোটা এলাকা ২৯টি স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার-ইউনিটে বিভক্ত। যেগুলির প্রতিটির গড় আয়তন ৫ হাজার একর। প্রতিটি খামার-ইউনিটে কৃষিখামার ছাড়াও পশুখামার, গবাদি পশুর প্রজনন কেন্দ্র, মাটি পরীক্ষা ও অন্যান্য গবেষণার জন্য পরীক্ষাগার, কৃষি গবেষণাকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, শস্যভান্ডার, বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র, সার ও কীটনাশক গুদাম, জল পরিশোধন কেন্দ্র, পরিবহন পরিচালনা কেন্দ্র, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি মজুত থাকে। কৃষিকাজে রাসায়নিক ব্যবহারের মাত্রা যাতে বিপদসীমা অতিক্রম না করে বা তা অন্য পরিবেশে যাতে কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে, সে বিষয়ে কঠোর নজর রাখা হয় – এমনটাই জানাচ্ছেন এগ্রিকস্ট-এর কর্ণধার লুসিয়ান বাজডুগান। তিনি বলেন, কৃষিতে বিজ্ঞানের সঠিকভাবে প্রয়োগ ঘটালে পরিবেশে তার কুপ্রভাব রোধ করা সম্ভব। তবে, এগ্রিকস্ট-এর মতো বিশালকায় খামারের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য এবং সেটা জোর গলায় বলা যায়। ছোট ছোট হোল্ডিং-এর খামারগুলো কম লাভজনক, তবে সেখানকার উৎপাদিত ফসল এলাকা ভিত্তিক বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

ব্যাপক জনগণের স্বার্থে আধুনিক কৃষি খামারের এই ধারণার জন্ম কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লবের পর দেশের সমাজতান্ত্রিক ভিতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট জোতের কৃষি জমিগুলিকে এককাট্টা করে বৃহদাকার খামারে পরিণত করা হয় ও কৃষিতে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ শুরু হয়। গ্রামে কৃষি খামারগুলিকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন করে তোলা হয়েছিল। খামারগুলি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক খামারে কৃষিকাজের জন্য নিত্যনতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার সঠিক প্রয়োগ কায়িক শ্রম লাঘব করতে থাকে অতি দ্রুত গতিতে। খাদ্য সমস্যার দ্রুত অবসান ঘটে গেল সারা দেশে। শুরু হয় সোভিয়েতরাজ – সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত। সোভিয়েতগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহুমুখী। সোভিয়েতের সমস্ত মানুষের জন্য ছিল অত্যাধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা যা ছিল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। সমাজতন্ত্রে মুনাফার জন্য উৎপাদন হয় না বলে সেখানে অতি উৎপাদনের কোন সংকট ছিল না, খামারগুলিতে ফসল বিক্রির কোন সংকট ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন বাজারের চাহিদা অনুযায়ী হয়, যেখানে মুনাফা সৃষ্টি করাই হল শেষ কথা। তাই একচেটিয়া যুগে এই সকল বৃহৎ খামারের কৃষি উৎপাদন অতি উৎপাদনের সংকটে ভুগছে। ভারতে বিবর্তনের ধারায় স্বতঃস্ফূর্তরূপে কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হয়েছে। কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা অপরিকল্পিতভাবে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে কৃষিজ উৎপাদন কৃষির প্রকৃত বিকাশের পথে বড় বাধা হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত উৎপাদন হয় সমাজের চাহিদা অনুযায়ী। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কয়েক দশক পর রাশিয়ার মানুষের সামাজিক জীবনের মানের উন্নতি ছিল পৃথিবীর মানুষের কাছে বিস্ময়। সেই অধ্যায় আজও বিশ্বের মানুষের কাছে মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে ইতিহাসের পাতায় জ্বাজ্বল্যমান। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব সপ্তম অংশ)

আমরা বিগত পর্ব পর্যন্ত দেখেছি যে রসায়ন বিদ্যায় ফ্লজিস্টন তত্ত্বের অবসান হয়ে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ল্যাভয়সিয়ের থেকে ডালটন সহ গে লুসাক-বার্জেলিয়াস পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অবদানে। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের এই জন্ম ইতিহাসেও দেখা যায় (পদার্থবিজ্ঞানের মতো) মানব সমাজের পরিবর্তিত অবস্থার ভূমিকা রয়েছে। মানব সমাজে যেখানে পুঁজিবাদ আসন্ন বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে পদার্থ বিজ্ঞানের মতো রসায়ন বিদ্যা রসায়ন বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করেছিল। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে এক ঝাঁক রসায়ন বিজ্ঞানীরও জন্ম হয়েছিল।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের ফলে মানুষ ফ্লজিস্টন তত্ত্বের মতো অলৌকিক বিশ্বাস মুক্ত হচ্ছিল। ফ্লজিস্টন তত্ত্বের অবসান হলেও জীব জগতের সঙ্গে অজৈব জগৎকে পার্থক্য করতে গিয়ে জীবনের পিছনে থাকা অপ্রাকৃত ও বস্তু সম্পর্কহীন কোনো কিছুর অস্তিত্বের কল্পনা থেকে বিজ্ঞানীরাও তখন মুক্ত হন নি। এর কারণ হল অজৈব প্রকৃতিতে গতির রূপ সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানের অভাব তখনও ছিল। এমনই ব্যাখ্যা করেছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্, এই প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের আগমনের পরও বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস মনে করতেন যে আমাদের প্রকৃতি জৈব বস্তু ও অজৈব বস্তুর সমাহার। এই জৈব বস্তুতে থাকে ভাইটাল ফোর্স বা গুরুত্বপূর্ণ বল। এই ফোর্সই জৈব বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্তা, যা অজৈব বস্তুতে না থাকায় তা নির্জীব। গতির রূপকে সমগ্র বস্তুজগতে পরস্পর সম্পর্কিত, পরিবর্তনশীল অবিচ্ছিন্ন না দেখে এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নরূপে দেখার কারণে জৈব ও অজৈব বস্তুকে বিচ্ছিন্ন সত্তায় দেখা হোত। মনে রাখার বিষয় হল এই ভাইটাল ফোর্সের ধারণাও এসেছে ফ্লজিস্টন তত্ত্বের সময়কাল থেকেই (ফ্লজিস্টন তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা স্টহ্ল ছিলেন ভাইটালিজমের জন্মদাতা)। বার্জেলিয়াস আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম ধাত্রী হলেও ভাইটালিজমে বিশ্বাস রাখতেন। জৈব বস্তু ও অজৈব বস্তু-র এই শ্রেণীবিভাগ তিনি ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণার বিপরীতে রসায়ন বিজ্ঞানীরা কতগুলি ঘটনা আবিষ্কার করলেন। ফ্যাট বা চর্বি যা জৈব বস্তুতে পাওয়া যায়, সেই প্রসঙ্গে গবেষণা করেছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী মিচেল অয়জেন শেভরল। তিনি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে সাবানকে অ্যাসিড সহ উত্তপ্ত করে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি পৃথক করেন। পরবর্তীকালে তিনি দেখান যখন ফ্যাট থেকে সাবান তৈরি হয় তখন গ্লিসারল নির্গত হয়। এরপর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী কার্চফ শ্বেতসারকে অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করে পান গ্লুকোজ। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী হেনরি ব্র্যাকোন্নট প্রোটিন জিলেটিন সংশ্লেষ করে পান গ্লাইসিন। এটি হল নাইট্রোজেনের জৈব অ্যাসিড। বার্জেলিয়াস এর নাম দেন অ্যামিনো অ্যাসিড। পরবর্তী শতকে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত প্রোটিন থেকে কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সন্ধান মেলে। এই ঘটনাগুলি বার্জেলিয়াসের ভাইটালিজম তত্ত্বের বিষয় প্রশ্ন উত্থাপন করলো।

ইতিমধ্যে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে গে-লুসাক এবং থেনার্ড হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পুরানো ল্যাভয়সিয়ের ধারণা অনুযায়ী তখনকার দিনে অ্যাসিডে অক্সিজেন উপস্থিত থাকবে এটাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই দুই বিজ্ঞানী একে অ্যাসিড বলেই উল্লেখ করেছিলেন। গে-লুকাস এবং থেনার্ড দেখলেন যে CN-এর জোট (যাকে তাঁরা সায়ানাইড গ্রুপ বলতেন), তা এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে স্থানান্তরিত হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরমাণুর স্থানান্তরে মতো করে। বাস্তবে ক্লোরিন বা ব্রোমিন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা সোডিয়াম ব্রেমোইড (NaBr) তৈরি করলে সেই যৌগগুলির সঙ্গে সোডিয়াম সায়ানাইড (NaCN) এর ধর্মের সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছিল। অর্থাৎ দুটি পরমাণুর জোট (কার্বনের এবং নাইট্রোজেনের) এখানে একটি পরমাণুর মতো আচরণ করছিল।

ভাইটালিজম তত্ত্বে প্রশ্ন ওঠার মাঝে এই মৌলজোট (গ্রুপ অফ এলিমেন্ট) এর আন্তর্সম্পর্ক তখনও স্পষ্ট হয় নি। এমন পরিস্থিতিতে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী লিবিগ একপ্রকার যৌগের সন্ধান পান, যাদের নাম দেন ফালমিনেট। প্রায় সমসাময়িক কালে আরেক জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ওহ্লার আরেকপ্রকার যৌগের সন্ধান পান, যাদের নাম দেন সায়ানেট। এই দুই প্রকার গবেষণার রিপোর্ট গে-লুসাকের কাছে পাঠানো

হয়। গে-লুসাক দেখেন যে উভয় ক্ষেত্রেই যৌগগুলির এম্পেরিকাল ফর্মুলা (এম্পেরিকাল কথার অর্থ যা পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত) বা সংকেত একই ছিল। উদাহরণ হিসেবে একপক্ষে পাওয়া সিলভার সায়ানেট, অন্যপক্ষে পাওয়া সিলভার ফালমিনেটের ধর্ম আলাদা হলেও তাদের এম্পেরিকাল ফর্মুলা (পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি সংকেত) একই ছিল। অর্থাৎ প্রতিক্ষেত্রে একটি অণুতে আছে একটি করে সিলভার, কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন। গে-লুসাক এই পর্যবেক্ষণের বিষয় বার্জেলিয়াসের কাছে পাঠান। বার্জেলিয়াস এই পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্য মেনে নিতে পারেন নি।

অবশেষে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে বার্জেলিয়াসের সহযোগী জার্মান কেমিস্ট ফ্রেডরিক ওহ্লার ভাইটালিজম তত্ত্বের অবসান ঘটানো শুরু করেন। ওহ্লার অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে (সে যুগে এই যৌগকে অজৈব যৌগ মনে করা হোত) একপ্রকার কেলাসের সন্ধান পান। এই কেলাস (যা কিনা ইউরিয়ার) আবার বিভিন্ন প্রাণী এমনকি মানুষের রেচন পদার্থ মুত্র থেকে পাওয়া যায়। বারবার এই পরীক্ষা করে তিনি একই ফল পান। ঘটনাটি তিনি বার্জেলিয়াসকে জানান। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বার্জেলিয়াস স্বয়ং দুটি জৈব যৌগ আবিষ্কার করেন, যাদের এম্পেরিকাল ফর্মুলা $C_4H_6O_6$। যৌগদুটি হল রেসেমিক অ্যাসিড এবং টারটারিক অ্যাসিড। বার্জেলিয়াস এই ধরনের যৌগের নাম দেন আইসোমার (গ্রিক শব্দ, যার অর্থ সমান অনুপাত)। **এর ফলে বার্জেলিয়াস সহ সকল ভিন্নমতের বিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে দুটি অণু একই রকম পরমাণুর একই সংখ্যা দিয়ে গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যকার ধর্মের পার্থক্য থাকতে পারে। এর কারণ সেই অণুগুলিতে পরমাণুগুলির সজ্জাবিন্যাস**। এভাবেই জানা গেল সিলভার সায়ানেটের ফর্মুলা হওয়া উচিৎ AgOCN, যেখানে সিলভার ফালমিনেটের ফর্মুলা হওয়া উচিত AgNCO।

১৮২৮-এর পরবর্তীকালে বার্জেলিয়াস জৈব যৌগে জীবনের উৎস ভাইটাল ফোর্সের বিষয় খুব একটা না বললেও জৈব ও অজৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে নিজস্ব মতামত রাখতে থাকেন। এবার নতুন আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের জোট, যাকে র‍্যাডিকেল বা মুলক বলা হয়, তা তিনি আইসোমারগুলিতে উপস্থিত দেখেন এবং এগুলো কেবলমাত্র জৈব যৌগেই উপস্থিত থাকে, অজৈব যৌগে নয় বলে তাঁর ধারণা হয়। এবার থেকে জৈব ও অজৈব যৌগের সংজ্ঞা পাল্টে গেল এবং ভাইটালিজম তত্ত্বের অবসান হল।

আমরা বিগত পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে তড়িৎ বিশ্লেষণ আবিষ্কারের পর ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হাম্ফ্রে ডেভি একে একে তড়িৎযোজী যৌগ পটাশ থেকে ধাতু পটাশিয়াম, সোডা থেকে সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়া থেকে ম্যাগনেশিয়াম, স্ট্রন্টিয়াম থেকে স্ট্রন্টিয়া, ব্যারাইটা থেকে বেরিয়াম এবং চুন থেকে ক্যালশিয়ামকে আলাদা করেছিলেন। ডেভি এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাঁর অধীনস্ত কর্মী মাইকেল ফ্যারাডে এই আবিষ্কারগুলির সাক্ষী ছিলেন। ইতিহাস দেখিয়েছে এই অধীনস্থ কর্মী তাঁর কর্তাকে অতিক্রম করে গেছিলেন। সেই ইতিহাস বলার সুযোগ এখানে নেই। ফ্যারাডে বিজ্ঞানের বহু শাখায় অসংখ্য অবদান রাখলেও এখানে আমরা তাঁর আবিষ্কৃত ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি থেকেই আলোচনা করবো। তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত দুটি সূত্র উত্থাপন করেন। প্রথম সূত্রে বলেন যে তড়িৎদ্বারে যে ভরের পদার্থ জমা হয় তা তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থে উপস্থিত তড়িৎ-এর পরিমাণের সমানুপাতিক। তাঁর তড়িৎ বিশ্লেষণের দ্বিতীয় সূত্রে বলেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহের ফলে তড়িৎদ্বারে যে ধাতু জমা হয়, তার তুল্যাঙ্কভার (eqnivalent weight) প্রবাহিত তড়িৎ-এর পরিমাণের সঙ্গে সমান। ইতিমধ্যে পাঠকরা পদার্থের পারমানবিক ওজন (atomic weight), তুল্যাঙ্কভার (eqnivalent weight), আনবিক ওজন (molecular weight)-এর বিষয়ে জেনে গেছেন। [বিগত অংশে আলোচিত হয়েছে] এবার আমরা পেলাম যে মৌলের তুল্যাঙ্কভারের সঙ্গে প্রবাহিত তড়িৎ-এর সম্পর্ক। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী লরেন্ট, এডওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ইত্যাদি বিজ্ঞানী গবেষণা করে বার করেন কোনো মৌলের রাসায়নিক সংযুক্তির ক্ষমতা বা তাদের যোজ্যতা (valency)। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে কোনো মৌলের পারমাণবিক ওজনকে তার তুল্যাঙ্কভার দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় তার যোজ্যতা।

এইবার ফ্যারাডের তড়িৎ রসায়ন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বার্জেলিয়াস ধারণা করলেন যে অজৈব অণুতে থাকা পরমাণুগুলিকে পরস্পর আকর্ষিত করে রেখেছে একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি। আবার জৈব অণুতে র‍্যাডিকেল এবং পরমাণু পরস্পর আকর্ষিত হয় একইরকম বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা। এদের এক পক্ষ ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত এবং অন্যপক্ষ ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টে লরেন্ট ইথাইল অ্যালকোহলের প্রস্তুতিতে ক্লোরিন পরমাণুকে হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে ক্লোরিনকে ধরা হয়েছে নেগেটিভ পরমাণু এবং হাইড্রোজেনকে পজিটিভ পরমাণু। এছাড়া কার্বনের সঙ্গে ক্লোরিনের সংযুক্তিতে যৌগ তৈরি হয় যেখানে প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানীরা কার্বন ও ক্লোরিন – উভয় মৌলের পরমাণুকে ঋণাত্মক তড়িৎ আহিত ধরতেন। বার্জেলিয়াস এইসব

ঘটনাকে একেবারেই মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন ব্যাপটিস্ট অ্যান্দ্রে দু'মাস, বিজ্ঞানী লরেন্টের বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলের পরীক্ষা করে হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণুকে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। ফলে রসায়ন বিজ্ঞানে বার্জেলিয়াসের শেষোক্ত চিন্তা খারিজ হয়ে যায়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বার্জেলিয়াসের মৃত্যুর পর চিরতরে তা বিস্মৃত হয়। ঐবছর লরেন্ট যৌগের মধ্যকার মৌল ও র‍্যাডিক্যালের সংযুক্তির নতুন তত্ত্ব আনেন। এই তত্ত্ব অনুসারে জৈব যৌগের অণুতে আছে একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস, যা সম্ভবত একটি পরমাণু, এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে র‍্যাডিক্যালগুলি। একই বছরে ফরাসী রসায়নবিজ্ঞানী চার্লস অ্যাডল্ফ ওয়ারটজ কতগুলি অ্যামোনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যৌগ পর্যবেক্ষণ করেন। এদের অ্যামিন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি দেখান যে এই যৌগগুলিতে নাইট্রোজেনকে কেন্দ্র করে (নিউক্লিয়াস করে) অন্য পরমাণুগুলি থাকে। অ্যামিনের ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যালগুলি হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে গড়ে ওঠে।

এই কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস সম্পন্ন আনবিক তত্ত্ব অন্যরকম হলেও এখানেও জৈব যৌগের অণুতে র‍্যাডিক্যালের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যাই হোক এই নতুন ধারণা এবং যোজ্যতার ধারণার সম্মিলিত রূপ অবশেষে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কেকুলের দ্বারা জৈব অণুর কাঠামো সংকেত (স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা)-র জন্ম দিয়েছিল। এখানে অবশ্যই কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকলো কার্বন। মনে রাখার বিষয় এই যে প্রকৃতিতে সর্বাধিক লভ্য মৌলগুলির মধ্যে একদম প্রথমে আসে কার্বন যে কিনা চর্তুযোজী। এই চর্তুযোজ্যতা আছে আরেকটি মৌলের, সে হল সিলিকন। কার্বনের চর্তুযোজ্যতাই তাকে স্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় অবস্থান দেয় যার সরলতম রূপ মিথেন। ইথেন, প্রোপেন সহ এই যৌগের সংকেত শৃঙ্খল বাড়িয়ে চললেও কেন্দ্রীয় অবস্থানে কার্বন বা তারই চেইন লক্ষ্যণীয়।

H	H H	H H H
1	1 1	1 1 1
H – C – H	H – C – C – H	H – C – C – C – H
1	1 1	1 1 1
H	H H	H H H
(মিথেন)	(ইথেন)	(প্রোপেন)

তবে এইভাবে জৈব যৌগের সংকেত লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পর তার ক্রমবিকাশ ফর্মুলার দ্বিপার্শীয় প্রতিসমতা সব ক্ষেত্রে আর বজায় রাখতে পারলো না, যেমন ইথাইল অ্যালকোহল, মিথাইল্যামিন –

H H	H	H
1 1	1	1
H – C – C – O – H	H – C – N – H	H – C – C ≡ N
1 1	1 1	1
H H	H H	H
(ইথাইল অ্যালকোহল)	**(মিথাইল্যামিন)**	**(মিথাইল সায়ানাইড)**

এই প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশের ফলে অবশেষে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কেকুলে বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারাল সংকেত তৈরি করে। বেঞ্জিনের এই সংকেত আগামীতে জৈব রসায়নে সংকেত লেখার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় হার্ডেল পার করে দেয়।

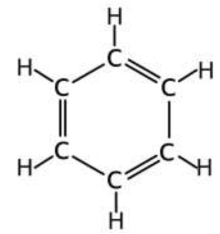

(বেঞ্জিনের স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা)

পোলারাইজড আলো (যেখানে আলোক তরঙ্গ একই সমতলে ওঠা-নামা করে) আবিষ্কারের পর সেই আলোকে কোনো জৈব অণুর কেলাসে ফেলে দেখেন ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী লুই পাস্তর। তিনি সোডিয়াম অ্যামোনিয়াম টারট্রেটের উপর তা ফেলেছিলেন। তিনি দেখেন যে সেই কেলাসগুলি অপ্রতিসম। কিন্তু কেকুলে কর্তৃক আবিষ্কৃত স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা এই অপ্রতিসমতাকে প্রতিষ্ঠা করে না (যে অপ্রতিসাম্য কেবলমাত্র ত্রিমাত্রিকভাবেই ধরা সম্ভব)। কারণ তাঁর ফর্মুলা দ্বিমাত্রিক। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ডাচ রসায়ন বিজ্ঞানী জেকব হেনড্রিকাস ভ্যান্ট হফ্ আবিষ্কার করেন যে চতুর্যোজী কার্বন পরমাণুগুলি ত্রিমাত্রিকভাবে স্পেসে (স্থানে) বিন্যস্ত। এর ফলে তারা পরস্পর চতুস্থলক রূপ নিয়ে থাকে। আজকের দিনে কার্বনের বিভিন্ন রূপভেদ (হীরে, গ্রাফাইট সহ)-এর ত্রিমাত্রিক গঠন বোঝা সম্ভব হয়েছে এবং তারফলে একই মৌলের বিভিন্নরূপ ভেদের ধর্মের পার্থক্যও বোঝা সম্ভব হয়েছে। যাইহোক সংক্ষেপে বললে এভাবেই জৈব অণুর ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া গেল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে যৌগের এই ত্রিমাত্রিক কাঠামো সংকেত সার্বিকভাবে গৃহীত হয়।

তাহলে আমরা এই পর্বে দেখলাম যে ভাইটালিজমের মতো অলৌকিকতাবাদ যা মানুষের অজ্ঞতার কারণেই ছিল, তা বৈজ্ঞানিক ধারণার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে (অর্থাৎ জৈব ও অজৈব পদার্থের অণুর গঠন, ফর্মুলা কি হবে তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে) দূরীভূত হয়েছে। এখান থেকেও আমরা শিক্ষালাভ করি যে অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসকে জ্ঞানের আলো দিয়েই দূর করতে হয়। (ক্রমশ)

ছাত্রছাত্রীদের কলম ঃ

আমাদের পরিবেশ

[গত ৫ই জুন ২০২৩, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধগুলির সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হল – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

১. রণি পান (অষ্টম শ্রেণী)

স্কুল পাঠ্য বইতে আমাদের পড়ানো হয়, মানুষ তার চারপাশে যা দেখতে পায় তাই নিয়ে তৈরি মানুষের পরিবেশ। আসলে মানুষ যা দেখতে পায় না তাও কিন্তু মানুষের পরিবেশ। কতগুলো অঙ্গ নিয়ে যেমন গঠিত হয় মানুষের শরীর, তেমনি প্রকৃতির অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষও কিন্তু এই প্রকৃতির অঙ্গ। আমি গ্রামের ছেলে। গ্রামের সবুজ নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশেই আমার বেড়ে ওঠা। গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর হলেও, আমার চোখে গ্রামের মানুষের জীবন ধারণের পরিবেশ মোটেই সুন্দর নয়। একজন মানুষের পরিবেশ সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য, সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। তা গ্রামের পরিবেশে প্রায় নেই বলেই চলে। আমাদের গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে একটি মাত্র স্কুল আছে। আশেপাশের প্রায় পাঁচ-ছ'টা গ্রামের ছেলে মেয়ে এই স্কুলে পড়াশোনার জন্য আসে। স্কুলে পড়তে আসা ছেলে মেয়েদের কাঁধে থাকে ছেঁড়া ব্যাগ, কারও কারও কাপড়ের থলি। তাদের পরনে মলিন ইউনিফ্রম, দু-এক জনের পায়ে ছেঁড়া ফাটা জুতো থাকলেও বেশির ভাগেরই পা থাকে খালি। আসলে এই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা স্কুলে আসে মিড-ডে মিলে দেওয়া খিচুঁড়ি আর আধখানা ডিম সিদ্ধর জন্য, স্কুল থেকে দেওয়া নতুন ইউনিফর্মের জন্য। স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ নেই, নেই পরিষ্কার শৌচালয়। শিক্ষার অভাব সর্বত্র। অবশ্য টাকা থাকলে ছেলেমেয়েদের দূরে শহরে পাঠিয়ে ৩-৪টে বোর্ড, নামি দামি স্কুল থেকে শিক্ষা কিনে দেওয়া যায়। এটা পারে কেবল গ্রামের জনাকয়েক ধনীচাষী, পঞ্চায়েত প্রধান এঁরাই। সেই সার্মথ্য খেটে খাওয়া গরীব চাষীদের নেই।

২. অনিন্দিতা শিকদার (সপ্তম শ্রেণী)

আমার মতে পরিবেশের অন্যতম সম্পদ হল মানুষ। তাই সাধারণ মানুষের ভালো থাকা, মানুষের মতো করে বাঁচা তাঁদের অধিকার। মানুষ ভালো থাকলে তবেই তো চারপাশের পরিবেশ সুন্দর হয়ে উঠবে।

প্রতিদিন সকালবেলা যে লোকটি ময়লার গাড়িতে করে ময়লা নিতে আসেন, তিনি তাঁর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কাজটি করে চলেছেন নিয়মিত।

কিন্তু একটু ভেবে দেখুন এই লোকটি-ই আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি যদি দু-তিন দিন ময়লা নিতে না আসেন তবে আমাদের কি অবস্থা হয়? অথচ এতো বিপজ্জনক অবস্থায় সারাদিন পরিশ্রম করার পরও তিনি কি তাঁর প্রাপ্য মজুরি পান?

একটু ভেবে দেখুন আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে দু-তিন দিন বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার না এলেও ততটা অসুবিধা হয় না, যতটা না দু-তিন দিন ওই বিদ্যালয়ের ঝাড়ুদার বা বাথরুম পরিস্কার করার লোকটি না এলে হয়। কিন্তু তারপরও কি তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও মজুরি পান?

আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করলেও সেটিকে চার্জ দেওয়ার জন্য সেই তো ঘুরে ফিরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরও বলা হচ্ছে যে আমাদের প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে। কিন্তু প্লাস্টিক তো আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বস্তু হয়ে উঠেছে। প্লাস্টিক বর্জন করতে হলে তো সামান্য চিপসের প্যাকেট থেকে শুরু করে ঘরের প্লাস্টিকের টেবিল-চেয়ার সমস্তই বর্জন করতে হবে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা কি সম্ভব? তাই আমার মতে প্লাস্টিককে মানব সমাজের হিতার্থে কাজে লাগিয়ে, রিসাইকেল পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্যার সমাধান করতে পারে একমাত্র সরকার।

আরও বলা হচ্ছে যে অধিক পরিমাণে কলকারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদি আরও নানা কিছুর জন্য বায়ুদূষণ বাড়ছে। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নও বাড়ছে। এই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে। কিন্তু মানুষই যদি বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী হন, তবে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আগে কেন বহুবার বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়েছিল?

৩. বিজয় ঠাকুর (অষ্টম শ্রেণী)

"পরিবেশ নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে মানুষও পরিবেশের অংশ। বাঁচার জন্য মানুষ না কতই কষ্ট করে! কিছু টাকা কামানোর জন্য বাবা-মা'কে তাদের প্রিয় সন্তানের থেকে বহু দূরে – ভিন্ রাজ্যে এমনকি ভিন্ন দেশেও গিয়ে থাকতে হয়। আমার ৭-৮ বছর কেটে গেছে মা'কে ছাড়া, মা থাকেন তামিলনাড়ু আর আমি ও বাবা কলকাতায়। বাবাও সারাদিন বাইরে থাকে শুধু রাতে বাড়ি থাকে। মা বছরে দু'বার আসে আমাদের কাছে। পৃথিবীতে সন্তানের জন্য সন্তান থেকে দূরে থাকার মত কাজ আর কোন প্রাণীকে করতে হয় না।"

৪. ঋষিতা জানা (সপ্তম শ্রেণী)

আমার বাবা গত বছর কেরালায় কাজের সূত্রে গেছে। সেখানে গিয়ে সে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। সেখানে রাজমিস্ত্রির কাজে অনেক ধুলো বালির পলিয়ুসন হয়। সেখানে পড়ার জন্য কোনো জ্যাকেট নেই, গ্লাভস নেই, মাস্ক নেই ও ফুলবুট সু নেই। সেখানে সে ও তার বন্ধুরা মিলে একটা বাড়িতে এক একটা ঘরে থাকে। একটা বাথরুম সবাই ব্যবহার করে।

৫. সুমিত গায়েন (নবম শ্রেণী)

আমার বাবা একজন সাফাইকর্মী। সকল সাফাইকর্মীরা নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখে। এর পরেও কিছু মানুষ আছে যারা এদেরকে খারাপ চোখে দেখে। পরিবেশ পরিস্কারের জন্য অনেক পরিশ্রম করার ফলেও বেতন খুবই সামান্য। তাই আমার মনে হয় সাফাইকর্মীদের দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

৬. সৃজিতা মজুমদার (সপ্তম শ্রেণী)

যারা ডাক্তার তাদের পরিবেশের ব্যাপারে একটু বলি। যারা ডাক্তার হয় তারা খাওয়া ঘুম ফেলে রেখে রুগীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা বা ব্যথা হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে চিন্তা করে। যেমন আমার বাবা একজন ডাক্তার। বাবার মানিকতলায় চেম্বার। বাবা সকাল ৮ টার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে যান। গিয়ে চেম্বারে বসেন। কোনো কোনো রুগী চেম্বারে দেখাতে আসলে বাবা তাদের দেখেন আবার কোনো রুগীর বাড়ি দূরে হলে বাড়ি গিয়ে দেখে আসেন। বাবা দিনে মোট চার পাঁচটা বাড়িতে রাতে গিয়ে রুগীদের দেখেন। কোনো কোনো সময় তাঁর খাওয়াই হয় না। বাড়িতে রাতে এসে খায়। বাবার বাড়ি আসতে রাত সাড়ে আটটা হয়ে যায়। সারাদিন ধরে তীব্র গরমে সবার বাড়ি গিয়ে রুগী দেখেন। সপ্তাহে বাবার কোনো ছুটি হয় না যতক্ষণ না রুগীর রোগ সারে। আবার কোনো রুগীর মারাত্মক কিছু হলে বাবা সব ডাক্তারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন আর বড়ো বড়ো ডাক্তারি বই পড়েন। কোনো হাসপাতালে বাবাকে যখন যেতে হয় তখন বাবাকে কোনো কোনো সময় অপরিচ্ছন টয়লেট ব্যবহার করতে হয় যা রুগী ও ডাক্তারা ব্যবহার করে। সরকারি হাসপাতালে রুগীদের জন্য কোনো পরিকাঠামো নেই। অথবা কোনো কোনো হাসপাতালে পরিকাঠামো থাকলেও সেগুলি তারা ব্যবহার করেন না। সেগুলি পরে পরে নষ্ট হয় বা কোনো হাসপাতালে পরিকাঠামো ব্যবহার করার জন্য কোনো লোক থাকে না, ফরে রুগী পরিসেবা পান না।

৭. পূর্ণিমা হালদার (অষ্টম শ্রেণী)

মানুষের পরিবেশ হলো মানুষকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা প্রতিবছর ৫ই জুন পরিবেশ দিবস পালন করি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ অর্ধাহার-অনাহার-অপুষ্টিতে দিন কাটান। শ্রমজীবী মানুষ বহু পরিশ্রম করে যে সামান্য আয় করেন তা দিয়ে তাদের পেট চলে না।

আমাদের দেশে চা শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুন। তারা সারাদিন রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক, মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকা মাকড়ের কামড় খেয়ে মাত্র কটা টাকার বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে। তার ওপর চা শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখারও তেমন কোনো সুযোগ সুবিধা নেই। খনি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক চর্মশিল্পের শ্রমিক, সাফাই শ্রমিক তো বটেই আধুনিক ভারী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদেরও জীবনের কোন দাম নেই।

৮. জয় হালদার (নবম শ্রেণী)

যেসব মানুষের কাছে প্রচুর অর্থ সম্পত্তি আছে তারা অর্থের জোরে সবকিছু কিনে নেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি। সেই সব মানুষের যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় সেই খবর আমাদের জানানোর জন্য সব খবরের কাগজের পাতায় অথবা খবরের চ্যানেলে হেডলাইন হিসেবে দেখায়। কিন্তু যেসব মানুষের কাছে অর্থ নেই, একমুঠো অন্ন রোজগার করতে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সেরকমই কিছু মানুষ, ধরুন শ্রমিকরা, শ্রমিক বলতে আমরা জানি অনেক রকম বিভাগের শ্রমিক আছে যেমন ধরুন কয়লাখনির শ্রমিক। তারা দিনের পর দিন কয়লাখনিতে কাজ করে সেখান থেকে কয়লা উত্তোলন করে। সেখানে তাদের প্রতি পদে পদে বিপদের আশঙ্কা থাকে, যেমন ধ্বস, কয়লার নিচে চাপা পড়া, বিষাক্ত গ্যাসের জন্য অনেক শ্রমিক মারা যায় আবার অনেক শ্রমিকের অনেক বড়ো রোগও হতে পারে কিন্তু তারা কোনো ভালো চিকিৎসা পায় না। তার ফলে বহু কয়লাখনির শ্রমিক মারা যায়। সেই সব শ্রমিকের খবর আমরা রাখি না। সেইসব শ্রমিকের জীবন কয়লার মতোই কালো হয়ে যায়।

৯. পিউ খাতুন (দশম শ্রেণী)

প্রকৃতি না বাঁচলে মানবজাতিই যে বিপন্ন! তাই এই দিনটিকে গুরুত্ব এবং এ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোই মূলত ৫ই জুনের বিশেষত্ব। বিশ্বায়ন যেভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়তে, ভূগর্ভের সঞ্চিত জল ও জ্বালানি তলানিতে এসে ঠেকেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতার সামনে যে বিশাল সংকট এসে উপস্থিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার উপরই নির্ভর করে। আচ্ছা পরিবেশ নিয়ে যখন এত মাতামাতি হয় তখন শুধু সবুজ পৃথিবীর কথাই শোনা যায়। আচ্ছা পরিবেশ মানে কি শুধুই গাছ-পালা, ফল-মূল এইগুলোই? না পরিবেশ হল মানুষকে কেন্দ্র করে তার চারপাশকে কেন্দ্র করে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ। গত দু-তিন বছর সারা বিশ্বে মহামারি লাগার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ চলে গেছিল এবং যাঁরা সেই সময় কাজ

করছিল যেমন ডেলিভারি বয়, ডাক্তার আরো অনেকে যেমন আমার বাবা একজন জল বিক্রেতা ছিলেন এই মহামারির মধ্যে সবার বাড়িতে গিয়ে জল দিয়ে আসতো, এই মানুষদের খুবই কষ্ট গেছে।

১০. রাজদীপ মজুমদার (ষষ্ঠ শ্রেণী)

আমি যেখানে বাস করি সেইখানে ঘুম থেকে উঠে চোখ খুললে দেখতে পাই একটা দূষিত পরিবেশ। যেখানে পশু পাখি নেই, নেই কোনো গাছ-পালা। আছে শুধু কলকারখানা, গাড়িঘোড়া ও শ্রমিজীবীরা। যেখানে বেশি আছে চা শিল্প। সকাল হতেই তারা এক মুঠো খাবারের জন্য কাজে বেড়িয়ে পড়ে। রোদ, ঝড়, জল, বৃষ্টি সব কিছুকে উপেক্ষা করে তারা নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একদিন কাজ না করলে তারা তাদের এক দিনের বেতন পাবে না। তাদের ইচ্ছে করে ছেলে-মেয়েদের উন্নত শিক্ষা লাভ করাবে কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তো উপায় নেই। তাই মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের একটি সুস্থ পরিবেশ দান করা এবং আগামী দিনগুলো যাতে তারা সুস্থ এবং কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি পায় সেই দিকে নজর রাখা।

১১. কমলিকা বৈরাগী (সপ্তম শ্রেণী)

আমার মা পেশায় একজন হাসপাতালের নার্স। তিনি ভোর বেলায় বাড়ির সব কাজ করেন। তিনি বাড়ির সব কাজ করে সকাল বেলায় হাসপাতালে রুগী দেখাশোনা করতে যান। তিনি সেখানে সারা দিন কাজ করেন। রুগি বেশি অসুস্থ থাকলে মা খেতে যেতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ডাক্তারদের সাথে অনেক কাজ করতে হয়। আবার অনেক সময় রুগি ঠিক থাকলে মা হাসপাতালের সব নার্সদের সঙ্গে ক্যানটিনে খেতে যেতে পারেন। আমার মা যেখানে কাজ করেন সেখানে অনেক জনকে মিলেমিশে কাজ করতে হয়। সেখানে যে যার কাজ করে। মা সন্ধ্যে বেলায় বাড়িতে ফেরেন। মা যখন বাড়ি ফেরেন তখন তিনি খুব ক্লান্ত থাকেন। মা যে হাসপাতালে কাজ করেন সেখানে বাথরুমের সমস্যা। সবাইকে একই বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। যেখানে রুগির প্রয়োজনীয় মেডিসিনের অভাব থাকে। অনেক সময় রুগি প্রয়োজনীয় মেডিসিন পেলেও অনেক দিন না ব্যবহার করার ফলে মেডিসিনগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

১২. সঞ্জীব বৈদ্য (দ্বাদশ শ্রেণী)

আমার মা একজন গৃহসহায়িকা। আমার মা সকালে উঠে পয়সা রোজগারের জন্য কাজে যান। সেই রোদেপুরে দুপুর বেলা পয়সা রোজগারের জন্য আবার কাজে যান। এক মাসের পরে তাকে তার রোজগারের পয়সাটা দেয়।

আমার বাবা রং মিস্ত্রির কাজ করেন। তাঁকে সারাদিন রোদের মধ্যে খাটতে হয়। তিনি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক। ফলে তাঁদের প্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়াগুলো জানানোর কোনো জায়গা নেই। তাঁরা যেদিন কাজ পাননা সেদিন তাঁদের আয়ের জোগার হয় না। কাজ করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দেখার লোক নেই। কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। শ্রমআইন অনুযায়ী যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত, তিনি তার কিছু পান না। তাই আমার মনে হয় পরিবেশে একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ মানুষের জীবন ধারণের পরিবেশ উন্নত হওয়া উচিত।

১৩. শ্রাবণ বৈদ্য (দ্বাদশ শ্রেণী)

যুগযুগান্তর ধরে আমাদের এই বসুন্ধরা জল, স্থল, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক সম্পদে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে। প্রকৃতির এই অপরিসীম বরদানে জীবকূল হয়েছে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। অথচ, জীবকূলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবেরই অত্যাধিক চাহিদা, পরিবেশকে বিপন্ন থেকে বিপন্নতর করে চলেছে প্রতিদিন। যার ফলে অনেক কিছুই আজ বিপদগ্রস্ত ও অস্তিত্ব রক্ষায় অপারগ হয়ে উঠেছে।

সভ্যতার প্রায় প্রথম লগ্ন থেকেই শ্রমিক সমাজ এর ধ্বজা বহন করে চলে বিপুল কর্মশক্তির মাধ্যমে। একই সঙ্গে, এই শ্রেণীই সর্বাধিক অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হয়ে চলে বিত্তবানদের হাতে। কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের শ্রমজীবীরা প্রতিনিয়তই লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়, ক্ষমতাশালী মালিকশ্রেণীর হাতে।

এখন আসা যাক দূরাভাষের মাধ্যমে ক্রেতাদের নির্দেশিত ও মূল্য দোকান খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যিক দ্রব্যগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সেই যুবক শ্রমিকদের কথা।

নির্দিষ্ট স্থান থেকে খাদ্য ও বাজার জাত দ্রব্যগুলি ঘরে ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেওয়া তাদের কাজ। এদের জন্য কোনো শ্রমিক সংগঠন প্রায় নেই। দিন-রাত, ঝড়-বৃষ্টি তুচ্ছ করে বাইকে করে এদের কাজ করতে হয় খুবই স্বল্প অর্থের বিনিময়ে। এই রসদ যোগানোর কাজটি নিতান্ত সহজ সাধ্য নয়। কারণ, খাদ্য ও বস্তুগুলি সময় মতো না পৌঁছালে গ্রাহকদের উষ্ণ ব্যবহার একই সঙ্গে তাদের কর্ম দক্ষতার উপর প্রশ্নচিহ্ন তোলে। কোনো দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে কোনো সুবিধা সবসময় পাওয়া যায় না। এই সব শ্রমিককূল যাদের সাহায্যে আমরা অনেক কিছুই বিনা আয়াসেই প্রায় পাই, তাদের প্রতি কি কিছুটা সহৃদয় ব্যবহার আমরা দেখাতে পারি না।

এদেরই মতো বিদ্যালয়ের বা মহাবিদ্যালয়ের পড়া কিছু ছাত্র শ্রমিক, হঠাৎ করে কিছু অর্থ ও একবেলা কিছুটা সুখাদ্য খাবার জন্য অনুষ্ঠান বাড়ির কেটারারদের অস্থায়ী খাবার পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত হয়। এরা অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের থেকে আসা। কয়েকশো টাকার প্রাপ্তি অনেকের বই খাতার খরচ যোগায়, কারও বা গৃহশিক্ষকের বেতনের কিছুটা সংস্থান হয়।

তাদের কাজগুলিও সহজ সাধ্য নয়। আপ্যায়নের কোনো ভুল ত্রুটি হল তাদের বকাঝকা ও বিদ্রুপবাক্য শুনতে হয়। খাবারের পাত্রগুলি ঘেঁটে এঁটোকাটা তাদের পরিস্কার করা, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সবই তাদের সামলাতে হয়।

১৪. স্নেহা সমাদ্দার (সপ্তম শ্রেণী)

আমার মা একজন গৃহসহায়িকা। মা রোজ সকাল ৭ টায় কাজে যায়। সেই কাজে ছুটি দেয় না। ছুটি নিলে মাইনে কেটে নেয়। সেখানে তাদের বাথরুম ব্যবহার করলে তারা অপছন্দ করে। মা কাজ থেকে দুপুর ১২টায় আসে। মাকে সেখানে খেতে দেয় না। মায়ের এত কাজ থাকায় তাই আমাদের সময় দিতে পারে না। মা'কে ঘরে এসে রান্না করতে হয়, বাসন মাজতে হয়, অনেক কাজ করতে হয়। তাই মা কখনো বিশ্রাম নিতে পারে না। মায়ের খুব কষ্ট হয়।

আমার বাবা সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে। বাবা রাতে কাজে যায়, সকাল বেলা আসে। সেখানের পরিবেশ খুব অপরিস্কার। বাবা'কে সেখানে খাবার নিয়ে যেতে হয়। সেখানে বাথরুম নেই। রাতে খোলা আকাশের নীচে সারারাত পাহাড়া দিতে হয়।

১৫. সৃজিতা বিশ্বাস (সপ্তম শ্রেণী)

আমরা যেখানে বাস করি আর চারপাশে অবস্থিত গাছপালা, পশু-পাখি, পাহাড়, জঙ্গল, নদী সব মিলিয়ে পরিবেশ। আবার বৃহত্তর পরিবেশ বলতে আকাশ, বাতাস সমস্ত জীব জগৎ তাদের আচার-আচরণকে বলতে বোঝায়, বিভিন্ন প্রাণীদের স্বভাবগত আচরণের জন্য বিশ্ব পরিবেশ আজও সংকটপূর্ণ – বিশেষ করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কিছু আচরণের জন্য পরিবেশের বিপর্যয় শুরু হয়।

এই পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য মানুষ আজও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। যেমন গাছ লাগানো, পরিবেশ স্বচ্ছ রাখা, নদী সাগর করা প্রভৃতি কাজ করছে। পরিবেশকে শোধন করার জন্য অন্যতম অবদান যার সে হল সাফাইকর্মী।

আমরা রাস্তাঘাট, সিনেমা হল, হাসপাতাল, অফিস রেলওয়ে স্টেশন, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি সব জায়গাতেই এদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি টের পাই। একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহরের পিছনে একজন সাফাইকর্মীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। সাফাইকর্মী না থাকলে হাসপাতালে রোগীর সুস্থ পরিসেবা পাওয়া অসম্ভব। স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এদেরই জন্য। যে সমস্ত ময়লা আবর্জনা আমরা ঘৃণা করে পাশ কাটিয়ে যাই সেগুলোই এরা যত্ন সহকারে পরিষ্কার করে, আমাদের সমাজকে বসবাস করার উপযোগী করে গড়ে তোলে।

পরিবেশ বিপর্যয়ে প্রতিরোধের এই প্রধান কান্ডারিদের, সমাজের কাছ থেকে জোটে কেবল অবহেলা, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই মানুষগুলির জন্য কিছু সম্মান অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

১৬. Ansuman Chakroborty (Class IX)

In our books we study that everything around us is environment. I think people are also a part of environment. From villages poor people come to big cities like Mumbai. There they get little amount of wages for hard work. They work in a poor environment. If any infection or accident takes place no one take care of them. Why they are in such a condition?

১৭. Sreyosh Ghorai (Class VIII)

Environment does'nt only says about the rubbish in the water, road and air. Environment says about the lifestyle, the things happening around, how people are risking or struggling there life, some of these people are the beggars, the people and small children of villages those who does'nt get facilities. We do not look at these people. These beggar in the corner of the road does not have any food to eat, they does not have any money to buy things. I see many beggar, not having his hand or leg, some are blind, some people just throw coin on them thinking of ignoring them. In this hot summer they sit in the ground get a broken bowl and just begging for the whole day and at night they just step in that dirty and dusty ground. In winter night, one of the beggar just go to shop buying a match stick. Some other beggars were finding some stick and light up them with the matchstick and everyone sits around in the fire. So let's together come and help these people out.

১৮. Aritra Mistry (Class IX)

A new baby after coming out from a mother's body watches greenery around it. But these environment does not means only plants, trees, mountains, ect. Humans are also a part of the environment. Humans plays vital role in the environment.

In India, many students are not getting any education in the villages. Because of their economic problem in their house. The government is also not giving proper facilities to the students for learning.

In government hospital proper treatment is not given because no senior doctor is present, mostly junior doctors are present and critical conditions of patient with low economic condition go to government hospital. So, there must be senior doctor present to do the serious surgeries and give a life to the people.

People working in the dirty areas for cleaning it are not given proper masks and they are inhaling the harmful gases and after some years they become patient to harmful diseases and led to death. So, they also must be provided with protective masks and dress.

ঃ সংগঠন সংবাদ ঃ

ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

বিগত ৮ই অক্টোবর ২০২৩ আমাদের সোনারপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে স্থানীয় জনগণকে ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রচার কর্মসূচী নেওয়া হয়। আমাদের কর্মী সমর্থকরা সোনারপুরের মিশনপল্লীর মোড়ে একত্রিত হয়ে কর্মসূচী শুরু করেন। মাইকে সেখানে একপ্রস্থ বক্তব্য রেখে প্রচারের পর পদযাত্রা করে আমরা সোনারপুর স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার অটোস্ট্যান্ডে সমবেত হই। সেখানে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনী সহ মাইকে প্রচার করেন ডেঙ্গু রোগটি কি, কিভাবে তা মানুষের মধ্যে ছড়ায়, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, চিকিৎসা এবং এর হাত থেকে বাঁচার জন্য একক উদ্যোগ নয় সামাজিক উদ্যোগের যে প্রয়োজন তা নানা উদাহরণ সহ তুলে ধরা হয়। একই কার্যক্রম আমরা তারপর পদযাত্রা করে নিকটবর্তী বৈকুণ্ঠপুরের মোড়ে করি। সমগ্র কর্মসূচীতে আমাদের কর্মীবাহিনীর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। স্থানীয় মানুষের অনেকেই আমাদের বক্তব্যগুলোয় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

আমাদের বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটে পথসভা এই বিষয়ে করা না গেলেও আমরা স্থানীয় একটি স্কুল সংলগ্ন, কলেজ সংলগ্ন ও আরো কয়েকটি জনবসতি এলাকায় এই বিষয়ে পোস্টারিং করেছি। ■

অক্টোবর বিপ্লবের সমর্থনে পোস্টার কর্মসূচী

আমাদের উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, কোচবিহারের ডাঙ্গারহাট, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, পূর্ব বর্ধমানে কাটোয়া, সমুদ্রগড়, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ-বারাসাত, হাওড়া জেলার আমতা থানায়, কলকাতায় বেহালা-ঠাকুরপুকুর ও গোচরণ-দক্ষিণ বারাসাত-জয়নগর-লক্ষ্মীকান্তপুর-কাকদ্বীপ এবং পাথর প্রতিমা অঞ্চলে এই বিষয়ে পোস্টারিং করা হয়। ■

অক্টোবর বিপ্লব উদ্‌যাপন আয়োজক কমিটির অংশীদার হিসেবে আলোচনা সভা

বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে এই আলোচনা সভা করা হয় ৪ঠা নভেম্বরে। এই আলোচনা সভার আলোচ্য বিষয় বস্তু ছিল 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সত্ত্বেও জনস্বার্থে প্রয়োগে বাধা কোথায় এবং সমাধানই বা কি?'

এই আলোচ্য বিষয় বস্তু পৃথক রচনায় পেশ করা হল। বনগাঁতে ৩রা নভেম্বর অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়।

এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোচরণ অঞ্চলে আমাদের কর্মীরা ৭ই নভেম্বর অক্টোবর বিপ্লব উদ্‌যাপন আয়োজক কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সভায় যোগদান করেন ও বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ঐ বিষয়ে আমাদের সদস্যদের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। ■

বেহালায় ৪ঠা নভেম্বর প্রোগ্রাম

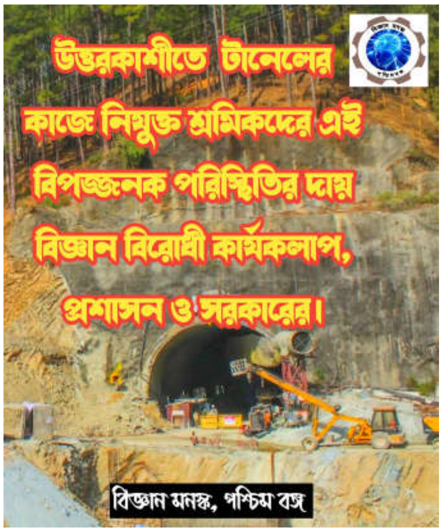

ছড়া ঃ

ছড়ায় নামতা

– তন্ময়

দুই এক্কে দুই, দুই দুগুণে চার
শনির বলয় বৈচিত্রময়, জুড়ি মেলা ভার।

তিন দুগুণে ছয়, চার দুগুণে আট
শুক্রগ্রহ সন্ধ্যাতারা উজ্জ্বলতার হাট।

পাঁচ দুগুণে দশ, ছয় দুগুণে বারো
সৌরজগতে বৃহস্পতি সব গ্রহের চেয়ে বড়।

সাত দুগুণে চোদ্দ, আট দুগুণে ষোলো
প্রাণের খোঁজে মঙ্গলেতে ঘুরে আসি চলো।

নয় দুগুণে আঠারো, দশ দুগুণে কুড়ি
চাঁদের মাটিতে নেই কোনো চরকা কাটা বুড়ি।

তিন এক্কে তিন, তিন দুগুণে ছয়
চব্বিশ ঘন্টায় পৃথিবীর একদিন হয়।

তিন তিরিক্কে নয়, তিন চারে বারো
জীবের প্রাণ আছে, প্রাণহীনেরা জড়।

তিন পাঁচে পনের, তিন ছয়ে আঠারো
বায়ু জল মাটিকে বিষ মুক্ত করো।

তিন সাতে একুশ, তিন আটে চব্বিশ
আকাশ জুড়ে লক্ষ নিযুত কোটি তারার মজলিস।

তিন নং সাতাশ, তিন দশে তিরিশ
রবির কিরণ জোগায় মোদের শক্তি অহর্নিশ।

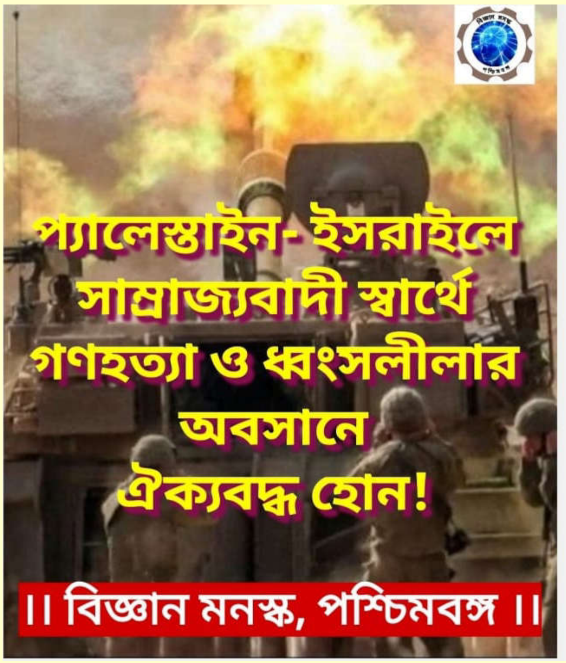

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা
Registration No.: SO197407 of 2012-13

সমাজ দর্পণ ঃ

অবশেষে নির্মীয়মান সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক উদ্ধার পেলেন

একচল্লিশজন শ্রমিক আটকে ছিলেন মাটির অনেক নিচে উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে। সতেরো দিন পর গত ২৯শে নভেম্বর তাঁদের নির্মীয়মান সুড়ঙ্গের গহ্বর থেকে উদ্ধার করা গেল। সুড়ঙ্গের ভেতর জমে থাকা ধ্বসের শেষ অংশটি হাতে কাটা হয়। তার আগে শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা বারে বারে বাধা পেয়েছে। শেষমেষ মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ প্রথম শ্রমিককে বার করে নিয়ে আসা হয়, আর বাকি সবাইকে বার করতে ঘন্টাখানেকেরও কম সময় লাগে। উদ্ধারের পর তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনাবাবাহিনী; বর্ডার রোডস অর্গানইজেশন সহ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করা হয়। এতদিন ধরে দুটো পাইপ দিয়ে শ্রমিকদের জন্য খাবার, পানীয় জল ও অক্সিজেন পাঠানো হচ্ছিল।

এই যে দুর্ঘটনাটি হয়েছে, তা হয়েছে নির্মীয়মান সুড়ঙ্গ ‘চারধাম প্রকল্প’-এর অংশে। এটি একটি বিতর্কিত প্রকল্প এবং বিশেষজ্ঞদের মতে প্রকল্পটি আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধ্বসের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যেভাবে লম্বালম্বি ভাবে পাহাড় কাটা হয়ে থাকে এই অঞ্চলে, তাতে নাকি ধ্বসের সম্ভাবনা যে কোনও মুহূর্তে। অথচ উপযুক্ত নিরাপত্তা না নিয়েই কাজ চলতে থাকে। ‘সেফ প্যাসেজ’ তৈরির কথা ভাবাই হয় না কাজ করার সময়। কর্তৃপক্ষের এই গাফিলতির ফলে নির্মীয়মান সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছিলেন শ্রমিকরা। যন্ত্র দিয়ে ৪৭ মিটার কাটার পর বাকি দশ মিটার হাতে কেটে শ্রমিকরাই শ্রমিকদের উদ্ধার করলেন। যে শ্রমিকরা শুধুমাত্র টুলস্ (ছেনি-হাতুড়ি) ব্যবহার করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন, তাদের বলা হয় র‍্যাটহোল মাইনার। মেটে ইঁদুরের মতো এঁরা বিপজ্জনক উপায়ে খনন কার্য করেন বেআইনী খাদানে। তাই তাঁরা আইনের জগতে নিষিদ্ধ অপরাধী। বড় বড় তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের বিদ্যা বুদ্ধি যেখানে নতি স্বীকার করেছে, সেখানে এই বেআইনী খাদানের তস্করাই বাঁচালো একচল্লিশটি প্রাণ। প্রকৌশল যে শ্রমেরই সৃষ্টি আরেকবার প্রমাণ হল।

শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার পরিবেশের মতো তাঁদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ চিরকালই বিপন্ন। মেঘালয় কিংবা ছোটনাগপুরে র‍্যাট হোল খনি গর্ভে নিয়ত প্রাণ দিচ্ছেন শ্রমিকরা, নির্মীয়মান বাড়ি-ওভার ব্রিজ ইত্যাদিতে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নেই। এটাই এই ব্যবস্থায় স্বাভাবিক। তাই একচল্লিশজন শ্রমিকভাইদের বেঁচে ফিরে আসাটা সত্যিই একটা সুখবর। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com